পুরাণের সেরা গল্প

শ্রীকৃষ্ণধন দে

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
৬।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগৌরহরি দাস
তারকনাথ প্রেস
২, শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

ভূমিকা

পুরাণের সেরা গল্প লিখতে বসে কেবলই মনে হয়েছে, সবই-যে সেরা গল্প, বাদ দোব কোন্-কোন্‌টি? ভারতবর্ষের পুরাণের গল্পের সংখ্যা এত বেশি যে সবগুলি নিতে হলে প্রকাণ্ড আকারের অনেক-পর্ব গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়,—তবুও সেখানে হয়ত কিছু বাদ থেকে যাবে।

এ সংকলনের গল্পগুলি কিশোর বয়সের উপযোগী, এ ছাড়া অতি-পরিচিত গল্পগুলিরও কিছু বাদ দিতে হয়েছে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। আশা করি এ পুস্তক পাঠে ছেলেমেয়েদের পুরাণ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান জন্মাবে। ইতি শুভ ১লা আশ্বিন, ১৩৭১ সাল।

৫।১ এ, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো,
কলিকাতা-৯

শ্রীকৃষ্ণধন দে

এতে আছে

সৌভরী মুনি ও পঞ্চাশটি রাজকন্যা

সৌভরী মুনি তপস্যা করতে ডুবে রইলেন হ্রদের জলে।

সে কী কঠোর তপস্যা! হ্রদের জলের মাছগুলো মহা বিপদে পড়ল। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই হয়ত মুনির গায়ে লাগবে তাদের স্পর্শ। তাতে মুনির ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে, মুনিও রাগ করে তপস্যার তেজে সব মাছকে মেরে ফেলতে পারেন। হায়, হায়, শেষে কি মুনির শাপে মাছের বংশ ধ্বংস হবে!

মাছেদের রাজার নাম সম্পদ। প্রকাণ্ড মাছ, খুব বুড়ো হয়ে গেছে। সংসারে তার স্ত্রী পুত্র নাতি নাতনী অসংখ্য। সেই সব মাছের আবার বংশবৃদ্ধি হতে হতে সারা হ্রদটা ছোট-বড় মাছে ভরে গেছে। সেই সব মাছ কেমন লেজ নেড়ে নেড়ে কান্‌কো ফুলিয়ে মুনির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। বেশ সুখী তারা। মুনি তপস্যা করতে করতে তাদের দিকে এক-একবার চেয়ে দেখেন। সৌভরী মুনির যোগবল খুব, তাই জলের নিচে থাকতে তাঁর কোন কষ্টই হয় না। সাধারণ মানুষের মত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর যোগবলে ত আর নেই। তাই তিনি জলের নিচে বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন, আর তপস্যা করছেন। তপস্যা তাঁর কঠোর বটে, কিন্তু মন তাঁর কঠোর নয়।

তিনি দেখেন মাছেদের খেলা। ছোট বড় মাঝারি সব রকমের মাছ কেমন খেলা করছে, ডিম পাড়ছে, ছোট্ট বাচ্চাদের

সঙ্গে নিয়ে জলের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ! মুনির তখন তপস্যার দিকে আর মন নেই। তিনি ভাবেন এই মাছগুলো যদি এইভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম করে তা'হলে না জানি মানুষ কত সুখেই স্ত্রীপুত্র নিয়ে জগতে বাস করছে। মুনি সৌভরী অবিবাহিত ব্রহ্মচারী, তাঁর মনে তখন বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছা জাগল, তপস্যায় আর মন রইল না।

হ্রদের জল থেকে উঠে পড়লেন তিনি। নির্জন হ্রদের চারপাশে লোকালয় নেই। বিয়ে করতে হলে লোকালয়ে যেতে হবে, তাই তিনি এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর শীর্ণ শরীর, মাথায় জটাজূট, আর জ্বলন্ত চোখ দেখে গ্রামবাসীরা ভয় পেলে। তারপরে যখন তারা শুনলে যে লোকটা বিয়ে করতে চায়, তখন সকলে তাঁকে পাগল বলেই ভেবে নিলে।

সৌভরী মুনি কিন্তু দমবার পাত্র নন, বিয়ে তিনি করবেনই কিন্তু গ্রামবাসীরা যখন কেউ তাঁকে মেয়ে দিতে রাজী হল না, তখন তিনি রাগ করে চলে গেলেন সে দেশের রাজার কাছে।

রাজার নাম মান্ধাতা, তাঁর দয়াধর্মও যথেষ্ট। তা'ছাড়া এমন দাতা তিনি যে, কোন প্রার্থীই তাঁর কাছ থেকে শুধু হাতে ফেরে না।

প্রকাণ্ড রাজসভায় বসে রাজা মান্ধাতা কাজকার্য করছেন এমন সময় সৌভরী মুনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

রাজা মুনিকে যথেষ্ট সমাদর করে প্রণাম জানিয়ে তাঁর সেখানে আগমনের কারণ কি, তা' শুনতে চাইলেন।

সৌভরী বললেন—"মহারাজ, আমি অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

—"কি বিপদ মুনিবর?"—রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—"আমি বিয়ে করে সংসারী হতে চাই।"

মুনির কথা শুনে সভাশুদ্ধ সকলে ত অবাক্! তপস্যা ছেড়ে মুনি কিনা বিয়ে করতে চান! আর এতে মুনির অত্যন্ত বিপদ কোথায়? বিয়ে ত প্রায় সকলেই করে থাকে।

রাজার হাসি পেল মুনির কথা শুনে। তিনি কৌতূহল চেপে রেখে বললেন—"এ আর এমন কি বিপদের কথা? বেশ, যাতে আপনার বিয়ে হয়, আমি তার ব্যবস্থা এখনি করে দিচ্ছি। আপনি বিশ্রাম করুন, জলগ্রহণ করুন।"

সৌভরী মুনি রাজসভায় আসবার আগেই শুনেছিলেন যে রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশটি অবিবাহিত মেয়ে আছে। তাই তিনি রাজার কাছে তখনি বললেন—"মহারাজ, আমি প্রার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ না হলে আমি আপনার এখানে জলস্পর্শও করব না। বলুন, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন?"

রাজা একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—"আমি ত আগেই বলেছি আপনার বিয়ের ব্যবস্থা আমি এখনি করে দিচ্ছি। কোন প্রার্থী আমার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফেরে না।"

সৌভরী মুনি তখন বললেন—"মহারাজ, আমি শুনেছি

আপনার পঞ্চাশটি অবিবাহিত কন্যা আছে। তাদের মধ্যে একটির সঙ্গে আপনি আমার বিয়ে দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

রাজসভায় তখনি বজ্রপাত হলেও সকলে তত আশ্চর্য হতেন না যত আশ্চর্য হলেন তাঁরা মুনির কথা শুনে। কিন্তু মান্ধাতা ছিলেন ধার্মিক রাজা। কথা দিয়ে কথা রাখবার মত মনের দৃঢ়তা তাঁর ছিল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন— "এতে আর ভাববার কথা কি আছে? আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তবে একটা বাধা আছে, আমার কন্যারা সকলেই যুবতী। স্বয়ংবর-রীতিই আমাদের কুলধর্ম। আমি কোনক্রমেই কুলধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। আমার পঞ্চাশটি মেয়ের মধ্যে যদি একজনও আপনাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করে তা'হলে আপনি স্বচ্ছন্দে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করব।"

সৌভরী মুনির আর দেরী সইছিল না, তিনি বললেন— "মহারাজ, তবে হয় কন্যাদের এখানে নিয়ে আসুন, নয় তো অনুমতি দিন আমি নিজেই তাদের কাছে যাই।"

এত বড় একটা বিসদৃশ কাণ্ড রাজসভায় যাতে সকলের সামনে না ঘটে, সেইজন্য রাজা কঞ্চুকীকে ডেকে সৌভরী মুনিকে রাজকন্যাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজকন্যারা তখন অন্তঃপুরে সুন্দর উপবনে বসে কেউ গান গাইছিল, কেউ ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথছিল, কেউ গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দুলছিল, কেউ বা ময়ূরের সঙ্গে

তালে তালে নাচছিল। সেই উপবনের কাছে কঞ্চুকী সৌভরী মুনিকে নিয়ে এল।

সৌভরী মুনি তখন যোগবলে এক পরম সুন্দর যুবকের মূর্তি ধরলেন। কোথায় গেল তাঁর জটাজূট আর কোথায় গেল তাঁর শীর্ণ শরীর আর লোলচর্ম! চমৎকার চেহারার একটি তরুণ হয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন রাজকন্যাদের কাছে।

রাজকন্যারা ত সেই অন্তঃপুরের উপবনে তাঁকে দেখে অবাক্। এমন সুন্দর চেহারার কোন যুবককে তারা এর আগে কখনও দেখে নি। রাজকন্যারা সব কিছু ভুলে অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

মুনি তখন বললেন—"মহারাজ মান্ধাতা পাঠিয়েছেন আমাকে তোমাদের কাছে। তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা করলে যে কেউ আমাকে পতিত্বে বরণ করতে পার।"

রাজকন্যারা ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে না পারলেও রাজার আদেশ শুনে ভাবলে—নিশ্চয়ই আমাদের অদৃষ্ট এবার সুপ্রসন্ন হয়েছে। তাই এমন সুন্দর এক যুবকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তখন সকলের মনেই জাগল তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা।

সকলের বড় যে রাজকন্যা, সে বলল—"আমিই তোমাদের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে বড়। আর আমার রূপ-গুণেরও তুলনা নেই। আমিই এই সুন্দর যুবকটিকে পতিত্বে বরণ করি, তোমরা কেউ এতে আমাকে বাধা দিও না।"

অন্যান্য রাজকন্যারা বললে—"বাঃ রে! আমরাই বা

রূপে গুণে কম কিসে ? তুমি শুধু আমাদের বড় বোন বলে যে একলা ওকেই বিয়ে করবে, তা হবে না।”

এই নিয়ে পঞ্চাশটি রাজকন্যার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হল। সকলেই সেই পরমসুন্দর যুবককে বিয়ে করতে চায়। তাদের অবস্থা দেখে সৌভরী মুনি মনে মনে খুব হাসতে লাগলেন।

সকলেই তখন এগিয়ে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। কোন রাজকন্যাই তাঁকে ছাড়তে চায় না। এর জন্যে তাদের মধ্যে হাতাহাতিও শুরু হয়ে গেল।

এই সময়ে রাজা মান্ধাতা এলেন সেখানে। মেয়েদের কাণ্ড দেখে তিনি ত অবাক্! শেষে তিনি বললেন—“বেশ ত, তোমরা সকলেই যখন এঁকে পতিত্বে বরণ করতে চাও, তখন সকলের সঙ্গেই এঁর বিয়ের অনুমতি দিলাম। তোমরা এঁকেই পতিত্বে বরণ কর।”

রাজকন্যারা তখন আহ্লাদে অধীর হয়ে তাড়াতাড়ি এক একগাছি ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এল মুনি সৌভরীর কাছে।

কিন্তু মুনি তখন যোগবলে আবার পূর্বের রূপ ধরেছেন। রাজকন্যারা তাদের সামনে হঠাৎ সেই সুন্দর যুবকের বদলে এক জরাজীর্ণ লোলচর্ম জটাজূটধারী মুনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে হতভম্ব! হাতের ফুলের মালা হাত থেকে খসে পড়ল তাদের। মুখে আর কথাটি নেই।

রাজা তখন সৌভরী মুনির পরিচয় দিয়ে রাজকন্যাদের বললেন—"এখন ত আমার কথার নড়চড় হবে না। তোমাদের সকলেরই এখন এঁকেই বিয়ে করতে হবে।"

রাজকন্যারা তখন আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিন্তু উপায় ত আর নেই।

মুনি সৌভরীর সঙ্গে পঞ্চাশটি রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজপুরীতে হাহাকার উঠল।

কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ ফুলে উঠেছে, সকলেরই তখন মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। এই মুনির সঙ্গে গভীর বনে তারা থাকবে কি করে?

মুনির মনে খুবই আনন্দ। একটি নয়, দু'টি নয়, একেবারে পঞ্চাশটি পত্নী লাভ হল তাঁর! একে ত আগে বিয়েই হচ্ছিল না, এখন এমন সৌভাগ্য যে তাঁর অদৃষ্টে হবে, কে জানত!

কিন্তু মুনির আশ্রমটি বড় নয়, সেখানে অতগুলো রাজকন্যা থাকবে কি করে? তারা মনের দুঃখে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলে। এখন আর পঞ্চাশ বোনের ঝগড়াঝাঁটি নেই, সকলেরই একই অদৃষ্ট। কি আর করতে পারে তারা?

কোথায় রাজভোগ, আর কোথায় এখানে বনের ফলমূল! মুখে কি কিছু রোচে? শীর্ণকায় বৃদ্ধ মুনি তাঁর প্রকাণ্ড জটাজূট নিয়ে হাসিমুখে রাজকন্যাদের কাছে এসে তাদের কি চাই জিজ্ঞাসা করেন।

রাজকন্যারা রেগে উঠে বলে—"এই পাতার কুঁড়ে ঘরে

থাকতে পারব না আমরা, চাই আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সুন্দর বাড়ী।"

মুনি মৃদু হেসে তখনি যোগবলে বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠান।

বিশ্বকর্মা এলে মুনি বলেন—"আজ রাত্রির মধ্যেই এই বনে পঞ্চাশটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করতে হবে তোমাকে।"

বিশ্বকর্মা রাজী হয়ে সেই রাত্রির মধ্যেই পঞ্চাশখানি বাড়ী তৈরী করে দেন রাজকন্যাদের থাকবার জন্যে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজকন্যারা দেখে বনের মধ্যে সারি সারি পঞ্চাশখানি বাড়ী। কি সুন্দর তাদের গঠন! আর চারপাশের সেই দুর্গম বন আর নেই, সেখানে ফলে ফুলে সাজানো চমৎকার উপবন রয়েছে।

তারা অবাক্ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চায়। যোগবলে কি না হয়! এতই যদি যোগবল, তবে মুনি কেন আবার সেই পরম সুন্দর তরুণের মূর্তি ধরে রাজকন্যাদের কাছে আসছেন না?

মুনি বোধ হয় তাদের মনের ভাব বুঝতে পারলেন, তাই তিনি প্রতিদিন পরম সুন্দর যুবকের রূপ নিয়ে তাদের কাছে আসতে লাগলেন। রাজকন্যারা মহাখুশি।

ক্রমে ক্রমে মুনি সৌভরীর একশোটি ছেলে জন্মাল।

রাজা মান্ধাতা এবার এলেন মুনির আশ্রমে মেয়েদের দেখতে।

—"কেমন আছিস্ তোরা?"—রাজা প্রশ্ন করলেন।

—"খুব ভাল আছি বাবা।"—হাসিমুখে উত্তর দিল মেয়েরা।

রাজা নাতিদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করলেন, ঋষির আশ্রম ভরে উঠল আনন্দ-কোলাহলে।

তারপর মেয়েদের ও জামাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মান্ধাতা ফিরে গেলেন নিজের রাজধানীতে।

মুনি সৌভরীর আর সুখের অন্ত নেই। একটি নয়, দু'টি নয়, একেবারে একশোটি ছেলে !

তপস্যা ভুলে গেছেন মুনি। দিনরাত শুধু রাজকন্যাদের নানা অভাব মেটান আর ছেলেগুলোকে নিয়ে খেলাধূলা আমোদ-আহ্লাদ করেন।

মুনির ছেলে হলে কি হবে, ছেলেগুলো মায়েদের আদরে একেবারে ডানপিটে ও দুরন্ত হয়ে উঠল। আশ্রমের গাছগুলোতে উঠে তারা ফল পাড়ে, ফুল ছেঁড়ে, নদীর জলে সাঁতার দিয়ে জল তোলপাড় করে আর মারামারি ত তাদের মধ্যে সর্বদা লেগেই আছে।

তা'ছাড়া মায়েদের উস্কানিতে বাপের ভালবাসা পাবার জন্য তাদের সে কী ভীষণ প্রতিযোগিতা ! সবসময়েই তারা লেগে থাকে সৌভরীর পিছনে। একদণ্ডও ছাড় নেই। মুনি ত অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর জপতপ যাগযজ্ঞ সব গেল রসাতলে ! পুত্র-বাহিনী নিয়ে তিনি ত একেবারে নাচার !

শেষে দেখেন রাজকন্যারাও তাঁকে রীতিমত শাসন করতে আরম্ভ করেছে। তর্জন গর্জন কটুবাক্যও বাদ যায় না। একদিকে একশোটি ছেলে, অন্যদিকে পঞ্চাশটি স্ত্রী। মুনির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ল।

এ অবস্থায় তিনি একদিন ভাবতে লাগলেন ঃ এই কি সংসার ? এর সুখ পাবার জন্যই কি তিনি তপস্যা ছেড়ে সংসারে এলেন ? উঃ, সেই হ্রদের মাছগুলো কী ভুল পথই তাঁকে দেখিয়েছিল ! এখন যে সংসার-সুখের ঠেলায় প্রাণ যেতে বসেছে !

মুনির একশো ছেলে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এমন দুরন্তপনা আরম্ভ করল যে, মুনির আশ্রমে তাদের জ্বালায় শান্তি বলে আর কিছুই রইল না। তাদের কাউকে কিছু বললে পঞ্চাশজন স্ত্রী এসে ছেলেদের পক্ষ নিয়ে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। দিনরাত আশ্রমে যেন হাট বসে গেছে।

মুনি এবার ভাবতে লাগলেন, কি করা যায় ! এদের ছেড়ে আশ্রম থেকে পালিয়ে গেলে হয় না ? কিন্তু আবার তখনি মায়ায় বদ্ধ হয়ে যান। কোথাও আর যাওয়া হয় না তাঁর।

শেষে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে 'দুত্তোর সংসার !' বলে মুনি বেরিয়ে পড়লেন আশ্রম থেকে।

আবার চলে গেলেন এক নির্জন বনে। সেখানে বসলেন কঠোর তপস্যায়। মন কিন্তু ঠিকমত লাগল না ধ্যান-ধারণায়।

তখন সে বন ছেড়ে আবার গেলেন আর এক বনে। সেখানেও হল তাঁর সেই একই অবস্থা।

শেষে অনেক পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে তিনি ফিরে গেলেন সেই আগেকার হ্রদের তীরে।

সেখানে আবার কঠোর তপস্যার জন্য ডুবে রইলেন জলের মধ্যে।

মাছেরা আগের মতই মুনির চারদিকে ঘোরাঘুরি করে, মাছেদের ছানাগুলো খেলা করে। মুনি আর সেদিকে তাকান না। ওরাই ত মজিয়েছে মুনিকে সংসারে,—ওরা আর ভোলাতে পারবে না তাঁকে।

এই ভাবেই এবার চলতে লাগল সৌভরী মুনির কঠোর তপস্যা হ্রদের জলের নিচে।

প্রচেতা ও মারীষা

গোমতী নদী বয়ে চলে কুলুধ্বনি তুলে। তার তীরে কণ্ডু মুনির আশ্রম।

চমৎকার আশ্রমটি। সেখানে হিংসা-দ্বেষ নেই, শুধু চিরশান্তি বিরাজিত। কণ্ডু মুনি ভাবলেন এমন চমৎকার আশ্রমে থেকে যদি কঠোর তপস্যাই না করলাম তবে এ জীবনে লাভ কি? এমন তপস্যা করতে হবে যাতে ত্রিভুবন সে তপস্যা দেখে আশ্চর্য হয়। কণ্ডু মুনি তাই তাঁর আশ্রমে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। গ্রীষ্মকালে আগুনের মধ্যে বসে, শীতকালে জলের মধ্যে ডুবে, কখনও পা ওপরে মুণ্ড নিচে রেখে, কখনও তীক্ষ্ণ কাঁটার ওপর বসে, কখনও বুকের উপর খুব ভারী পাথর চাপিয়ে নানা ভাবে কঠোর তপস্যা করে চললেন কণ্ডু মুনি।

তাঁর তপস্যা দেখে সেই বন থেকে পশু পাখী সব ভয়ে পালিয়ে গেল। বনবাসীরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

কণ্ডু মুনির তপস্যা দেখে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ভাবলেন, এ কী কাণ্ড! এত কঠোর তপস্যা করছে কেন কণ্ডু মুনি? উদ্দেশ্যটা তার কী? আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে স্বর্গের রাজা হয়ে বসবার মতলব নয় তো?

ব্যাপার সুবিধার নয় ভেবে ইন্দ্র তখনি ডাকলেন সুন্দরী অপ্সরা প্রম্লোচাকে।

অপ্সরা করজোড়ে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রের সামনে। ইন্দ্র তাকে দেখে বললেন—"দেখ, প্রম্লোচা, তোমাকে একবার মর্তে যেতে হবে।"

—"মর্তে ? কেন দেবরাজ ?"—উৎকণ্ঠিত হয়ে ভয়ার্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করল প্রম্লোচা।

—"কে একজন কণ্ডু মুনি তপস্যার বড় বাড়াবাড়ি করছে। তাকে তপস্যার পথ থেকে সরাতে হবে।"

—"তা' আমাকে এর জন্যে মর্তে যেতে হবে কেন ?"

ইন্দ্র তখন মৃদু হেসে বললেন—"আমার অপ্সরাদের মধ্যে আজকাল তোমার মত সুন্দরী আর দেখতে পাই না। আর নাচগানেও তুমি বেশ পটু। তাই তুমি কণ্ডু মুনির আশ্রমে গিয়ে নাচগান করে তাকে ভুলিয়ে তপস্যা থেকে সরিয়ে আনো। তপস্যা বন্ধ হলেই তুমি স্বর্গে ফিরে আসবে। বেশিদিন তোমাকে মর্তে থাকতে হবে না।"

প্রম্লোচা মহাচিন্তায় পড়ল। ইন্দ্রের আদেশ ত অমান্য করা যায় না! স্বর্গের সুখ ছেড়ে মর্তের এক মুনির আশ্রমে যাওয়া যে কত কষ্টকর, প্রম্লোচা সে কথা অন্য অপ্সরাদের কাছে শুনেছে। কিন্তু উপায়ই বা কী। শেষে সে রাজী হল ইন্দ্রের কথায়।

*

কণ্ডু মুনি তপস্যা করে চলেছেন নির্জনে এক শুকনো

গাছের নিচে। ধূলো উড়িয়ে আগুনের মত গরম বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাঁর চারপাশে।

হঠাৎ ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুম্ ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুম্ শব্দ এল তাঁর কানে। বিরক্ত হয়ে তপস্যা ছেড়ে তিনি চোখ মেললেন।

সামনে তাঁর এক পরমা সুন্দরী তরুণী অপরূপ বেশভূষা পরে অপূর্ব ছন্দে নৃত্য করছে। তার রূপে বন যেন আলোয় ভরে উঠল।

শুধু তাই নয়, যে শুকনো গাছের নিচে তিনি বসেছিলেন সে গাছ ফুলে ভরে উঠেছে; আগুনের মত গরম হাওয়ার পরিবর্তে ফুলের গন্ধভরা মৃদুল মলয় বাতাস বইতে শুরু করেছে আর ডালে ডালে কোকিল ডাকছে কুহু-কুহু-কুহু!

কণ্ডু মুনি তখন একদৃষ্টে দেখছেন প্রম্লোচার নাচ। কি চমৎকার তার নাচের ছন্দ, কি মনমাতানো গান।

মনটা বড়ই উদাস হয়ে গেল কণ্ডু মুনির। তপস্যা ছেড়ে উঠে তিনি এগিয়ে গেলেন প্রম্লোচার কাছে, জিজ্ঞাসা করলেন হাসিমুখে—"কে তুমি সুন্দরি, এ বনে কেন এসেছ?"

খিল-খিল করে হেসে উঠে নাচের ভঙ্গিমায় দেহখানি নুইয়ে মধুর কণ্ঠে প্রম্লোচা বললে—"আমি এসেছি তোমারই জন্য।"

—"আমার জন্য?"—অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন কণ্ডু মুনি।

—"হাঁ, তোমারই জন্য।"—মিষ্টি হাসি হেসে বলে প্রম্লোচা।

—"তুমি আমাকে রোজই এমনি নাচ দেখাবে?"

—"নিশ্চয়ই।"

কে তুমি সুন্দরি, এ বনে কেন এসেছ ?

—"তোমার গলাটি ভারি মিষ্টি,—রোজই এমনি গান শোনাবে আমাকে ?"

—"নিশ্চয়ই। শুধু নাচগান কেন, আমি আপনার আশ্রমে থাকতে এসেছি।"

—"আরে, তা' কি হয় না-কি! আমার আশ্রমে তুমি থাকবে কেন ? এখানে কত কষ্ট!"

—"থাকা শুধু তোমারি জন্য।"—খিল-খিল করে হেসে ওঠে প্রম্লোচা।

মুনি দেখেন মহাবিপদ! কিন্তু ঝুম্‌ঝুম্‌ করে ঘুঙুর বাজিয়ে প্রম্লোচা ততক্ষণে কণ্ডু মুনির আশ্রম সাজাতে-গোছাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

অগত্যা মুনি আর কিছু বললেন না। প্রম্লোচা ফুল এনে সাজাল পর্ণকুটীর, ভৃঙ্গারে জলভর্তি করে তাতে ফুলের রেণু মিশিয়ে সুগন্ধি করলে, পাতার বিছানা ফেলে দিয়ে ফুলের বিছানা পাতলে, খাঁচা তৈরী করে তিন-চারটে কোকিল ধরে তার মধ্যে রাখলে, আর মুনির সামনে হেসে হেসে ঝুম্‌ঝুম্‌ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কণ্ডু মুনি অবাক্‌ হয়ে ভাবলেন, এর মতলবটা কি ? আমার আশ্রমে সত্যই এ থাকবে না-কি ?

প্রম্লোচা তখন কণ্ডু মুনিকে বললে—"তুমি ফলমূল খেয়েই থাক দেখছি,—কিন্তু এখন থেকে কিছু হবি আর ইঙ্গুদি তৈল এনে রাখ, আমি খাবার তৈরী করে তোমাকে খাওয়াব।"

মুনি বললেন—"ব্যাপার কি বল ত? তুমি কি এখানে থাকবে না-কি?"

—"যদি থাকতে চাই, তুমি কি থাকতে দেবে না?"

—"এটা আশ্রম, আমার তপস্যাক্ষেত্র। এখানে নারীর স্থান নেই।"

—"বেশ আমি থাকব না, তবে আমার নাচ দেখতে দোষ কি?"

—"না, সেটাও চলবে না এখানে। তুমি এখনি চলে যাও।"

—"বেশ যাচ্ছি, তবে এত কষ্ট করে এলাম, একটু নাচ দেখাব না?"

কণ্ডু মুনির উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রম্লোচা নাচতে আরম্ভ করলে ঝুম্-ঝুম্-ঝুমুর-ঝুম্।

সে কী নাচ! স্বর্গের অপ্সরার অপূর্ব নাচ দেখে মুনির মন কেমন-যেন উদাস হল। ভাবলেন, তপস্যার ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু নাচ দেখলে ক্ষতি কি?

প্রম্লোচা তখন নাচ-গানে মুনির মন অভিভূত করেছে, বললে—"যাক্, নাচ দেখানো হল, এবার আমি চলে যাই তোমার আশ্রম ছেড়ে।"

মুনি বললেন—"আর একটা নাচ দেখাও, তারপরে যেও।"

প্রম্লোচা খিল-খিল করে হেসে বললে—"আমি কি যেতে চাইছি, তুমিই ত আমাকে তাড়াচ্ছ।"

—"না, না, সে কি কথা! তুমি আবার নাচ।"

প্রম্লোচা আবার নাচতে আরম্ভ করলে। স্বর্গের নাচ কি-না, তাই তার নাচের সঙ্গে সঙ্গে গাছে গাছে অজস্র ফুল ফুটে উঠল। কোকিল ডাকতে শুরু করল আর মলয় বাতাসে চন্দন-গন্ধ ভেসে আসতে লাগল।

মুনির অনুরোধে প্রম্লোচা সেই আশ্রমে থাকতে রাজী হল। মুনি খুব খুশি। তপস্যাও করা যাবে, আর নাচও দেখা যাবে।

*

কণ্ডু মুনি রোজ প্রম্লোচার নাচ দেখেন আর সেবা পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হন।

ক্রমে মুনি তপস্যা ভুলে গেলেন, দিনরাত কেবল দেখেন নাচ আর শোনেন গান।

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। তপস্যার আর নামটি নেই মুনির।

হঠাৎ একদিন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের পানে চেয়ে মনে পড়ল মুনির সান্ধ্য আরাধনার কথা।

প্রম্লোচাকে সে কথা বলতেই সে বলল—"ক'বছর পরে সন্ধ্যাকৃত্যের কথা বুঝি মনে পড়ল তোমার ?"

—"ক'বছর পরে ? সে কি ! তুমি ত আজ সকালেই এসেছ আমার আশ্রমে !"

এবার প্রম্লোচা খিল-খিল করে হেসে উঠল, বলল—"আমার নাচগানে মোহিত হয়ে তোমার এমনই মতিভ্রম হয়েছে বটে !"

কণ্ডু মুনি উঠলেন রেগে—"সে কি! তবে কি আমি তপস্যা থেকে বিচ্যুত হয়েছি?"

—"তপস্যা আর কেন? আমার নাচ-গান দেখে শুনেই জীবন কাটাও।"—হেসে হেসে বলল প্রম্লোচা।

কণ্ডু মুনি তখন আরো রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

প্রম্লোচা এবার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে সকল কথা খুলে বললে। ইন্দ্রই তাকে পাঠিয়েছেন তাঁর তপোভঙ্গ করতে।

—"ইন্দ্র? দেবরাজ হয়ে তাঁর এই কাণ্ড! মুনি-ঋষির কঠোর তপস্যা দেখলেই অমনি তাঁর ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়? বেশ, আমি আরো কঠোর তপস্যা করব, দেখি ইন্দ্র কী করতে পারে! আচ্ছা তোমার অপরাধ মার্জনা করলাম,—তুমি এখন স্বর্গে ফিরে যেতে পার।"

প্রম্লোচা ভয়ে ঘেমে উঠেছিল, এখন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে তার ঘাম আশ্রমের গাছের পাতায় মুছে স্বর্গে চলে গেল।

এদিকে এক অবাক্ কাণ্ড! সেই পাতায়-মোছা ঘাম থেকে জন্ম নিল এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা, নাম হল তার মারীষা।

মারীষা ক্রমে বড় হল। অপরূপ সুন্দরী তরুণী হয়ে সে আশ্রম আলো করে রইল।

এদিকে একদিন প্রাচীনবর্হিঃ-রাজার দশটি ছেলে এল সেই বনে মৃগয়ায়!

তারা সকলে মারীষার রূপ দেখে একেবারে মোহিত।

দশ ভাইয়ে খুব ভাব। দশ ছেলেরই একনাম—প্রচেতা। তাই তারা দশজনে মিলে মারীষাকে বিয়ে করে স্বরাজ্যে ফিরে গেল।

রাজা প্রাচীনবর্হিঃ কী আর করেন! তিনি মারীষাকে দশ ছেলের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন পরে মারীষার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন, তিনিই হলেন ভুবনবিখ্যাত দক্ষ প্রজাপতি।
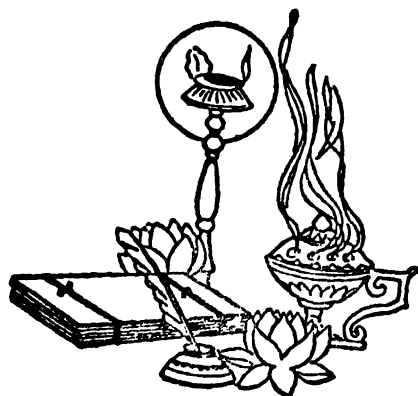
ভার্গব ঋচীক ও সত্যবতী

মহারাজ গাধি হলেন মহাপরাক্রমশালী নরপতি। কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই। হায় রে, একটি সন্তানও যদি তাঁর জন্মলাভ করত!

নিঃসন্তান রাজা বড়ই মনঃকষ্টে আছেন। কত রকম যাগযজ্ঞ করেন, কত দেবতার পূজা-অর্চনা করেন, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে কত ধনরত্ন দান করেন কিন্তু মনের বাসনা তাঁর পূর্ণ হয় না।

শেষে একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, তাঁর একটি কন্যা জন্মাল। রাজা নাম রাখলেন তার সত্যবতী।

সত্যবতীর মত এমন রূপবতী কেউ কোনদিন দেখে নি, তার মুখের কথার মত মধুর কথা কেউ কোনদিন শোনে নি। রাজ্য জুড়ে সত্যবতীর প্রশংসা। রাজা গাধি খুবই খুশি।

ক্রমে সত্যবতীর বিয়ের বয়স হল। তরুণী সত্যবতীর রূপ যেন ফেটে পড়ছে। রাজার একমাত্র সন্তান, তাই সব জায়গায় তার অবাধ গতিবিধি।

একদিন সত্যবতী উপবনে খেলা করছিল, হঠাৎ সেই উপবনের পাশ দিয়ে ভার্গব ঋচীক নামে এক মুনি যাচ্ছিলেন।

ভার্গব ঋচীক বড় সহজ মুনি নন, সারাজীবন জপতপ নিয়েই আছেন। কিন্তু তরুণী সত্যবতীকে দেখে তিনি একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। এত রূপ কি মানবীর হয়! যেখানে

যাচ্ছিলেন, সেখানে আর তাঁর যাওয়া হল না, সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি রাজা গাধির রাজসভায়।

ভার্গব ঋচীককে দেখে গাধি মহাসমাদরে তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর সংবর্ধনা করলেন, তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মুনিবর, বলুন আমার উপর আপনার কি আদেশ ?"

ভার্গব ঋচীক বললেন—"আমার প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করবেন ত মহারাজ ?"

—"সাধ্য হলে নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। আপনি নিশ্চিন্তমনে আমার কাছে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারেন।"

—"তবে শুনুন মহারাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই।"

রাজসভার সকলে অবাক্! মুনিটা বলে কী! রাজা গাধি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন মুনির দিকে।

রাজা কোন উত্তর দিচ্ছেন না দেখে ভার্গব ঋচীক খুব চটে উঠলেন; বললেন—"যদি আমার প্রার্থনা আপনি পূর্ণ না করেন তা'হলে আমি আপনাকে এমন অভিশাপ দেব যাতে আপনার রাজ্য ধ্বংস হবে আর আপনি অনন্তকাল নরকে পচে মরবেন।"

রাজা ও রাজসভার সকলে ভয়ে শিউরে উঠলেন—সর্বনাশ! অনন্তকাল নরকে পচে মরা ত সহজ কথা নয়!

রাজা গাধি তখন করযোড়ে ভার্গব ঋচীককে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করলেন তাঁর এ প্রার্থনা ফিরিয়ে নেবার জন্য। অন্য যা তিনি চান রাজা তাই দেবেন মুনিকে।

কলসী কলসী ঘি দেবেন যজ্ঞ করতে, শত শত গাভী দেবেন আশ্রমে দুধ দিতে, বোঝা বোঝা চন্দনকাঠ দেবেন যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ; আর মুনি-ঋষিদের খাদ্য আতপ চাল, ফলমূল গাড়ী গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন আশ্রমে।

কিন্তু ভার্গব ঋচীক অচল অটল। তিনি সত্যবতীকে বিয়ে করবেনই।

মুনির অভিশাপের ভয়ে রাজা গাধি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে অগত্যা রাজী হলেন তাঁর সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে দিতে। রাজপুরীতে হাহাকার উঠল।

বিয়ের আগে রাজা গাধি বললেন—"মুনিবর, আপনি ত আমার কন্যাকে বিয়ে করছেন, কিন্তু আপনি যে যোগবলে বলী—এটা সকলের সাক্ষাতে প্রমাণ করুন।"

—"আমাকে কি করতে হবে মহারাজ ?"

—"আপনি আমাকে এই দণ্ডে এক হাজার নিখুঁত সাদা-রংয়ের ঘোড়া এনে দিন।"

ভার্গব ঋচীক তখন মন্ত্রপাঠ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে এক হাজার ঘোড়াকে আহ্বান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দূরে খট্‌খট্‌ শব্দ। সে শব্দ ক্রমে বাড়তে লাগল। চারদিকে ধূলো উড়তে লাগল আর ভয়ানক রকমের খট্‌ খট্‌ খটাখট্‌ শব্দে কানে তালা লাগবার উপক্রম হল। দেখতে দেখতে এক হাজার নিখুঁত সাদারংয়ের ঘোড়া রাজপ্রাসাদের সামনের মাঠে এসে হ্রেষা রব করতে করতে ঘন ঘন পা ঠুকতে লাগল।

রাজা ও রাজপরিবারের সকলে মহাখুশি। হাঁ, ভার্গব ঋচীক ঋষির যোগবল আছে বৈ কি!

এবার আর তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজার আর কোন আপত্তি রইল না।

*

গভীর নির্জন বনে ভার্গব ঋচীক মুনি তাঁর নব-বিবাহিতা স্ত্রী রাজকুমারী সত্যবতীকে নিয়ে পরম সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। কিন্তু মুনির মনে শুধু একটা দুঃখ, তিনি অপুত্রক রয়ে গেলেন।

যোগী পুরুষ তিনি, তাই একটা যজ্ঞ করবার মতলব করলেন।

মুনি পুত্রযাগ করবেন শুনে সত্যবতীর মাও আশ্রমে ছুটে এলেন। জামাইকে বললেন—"আমারও ত পুত্র হয় নি! তুমি আমার জন্যেও একটা যজ্ঞ করো বাবা!"

ভার্গব ঋচীক বললেন—"বেশ ত মা, আপনার মেয়ের জন্য যেমন যজ্ঞ করছি আপনার জন্যও তেমনি যজ্ঞ করব। দুটি যজ্ঞই একসঙ্গে হবে।"

এই বলে ভার্গব ঋচীক যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। তবে তিনি ভাবলেন, রাণীর যে সন্তান হবে সে হবে রাজার সন্তান তাই তার মধ্যে থাকা চাই ক্ষত্রিয়ধর্মের সমস্ত গুণ; আর আমি ব্রাহ্মণ, আমার পুত্রের মধ্যে থাকা চাই ব্রাহ্মণধর্মের গুণ। তাই সেই ভাবে তিনি দুটি যজ্ঞের চরু আলাদা করে রাখলেন।

এদিকে ভার্গব ঋচীক আশ্রম ছেড়ে একটু বাইরে গেছেন, এমন সময় রাণী তাড়াতাড়ি এসে দুটি চরুর মধ্যে থেকে একটি চরু খেয়ে ফেললেন। সত্যবতীও অত না বুঝে অপর চরুটি খেল। এদিকে ভার্গব ঋচীক আশ্রমে ফিরে এসে যখন শুনলেন তাঁর শাশুড়ী ও স্ত্রী দু'জনেই চরু খেয়ে ফেলেছে আর যার জন্যে যে চরু সে তা না খেয়ে অপরের চরু খেয়েছে তখন তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। শাশুড়ীকে ডেকে বললেন—"মা, আপনার জন্য রেখেছিলাম ক্ষত্রিয়গুণের চরু। কিন্তু, আপনি ভুল করে খেয়েছেন ব্রাহ্মণগুণের চরু। আর আমার স্ত্রীর জন্যে রেখেছিলাম ব্রাহ্মণগুণের চরু, সে তা না খেয়ে খেয়েছে ক্ষত্রিয়গুণের চরু। তাই আপনার যে সন্তান হবে সে হবে ব্রাহ্মণ-ভাবাপন্ন। আর আমার যে পুত্র হবে সে হবে ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তাড়াতাড়ি চরু খেতে গেলেন কেন? এখন ত আর উপায় নেই, যা হবার তাই হবে।"

যথাসময়ে রাণীর যে পুত্র হল তার নাম হল বিশ্বামিত্র। তিনি তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন, আর সত্যবতীর যে পুত্র হল তার নাম জমদগ্নি। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রমাণ করলেন যে তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর রক্তে ক্ষত্রিয়ধর্মের তেজ ছিল।

এই ভাবে ভার্গব ঋচীক মুনি পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করলেন।

যুবনাশ্বের উপাখ্যান

শ্রাবস্তি রাজ্যের রাজা যুবনাশ্ব।

রাজা অপুত্রক, তাই অতবড় রাজ্যের রাজা হয়েও তাঁর মনে সুখ নেই।

মুনি-ঋষিদের ডেকে রাজা যুবনাশ্ব বিনীতভাবে বললেন—"আপনারা মহাতপস্বী, অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন। আপনারা বলুন আমি কেমন করে আমার অপুত্রক নাম দূর করব।"

মুনি-ঋষিরা সকলে বললেন—"মহারাজ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন, নিশ্চয়ই আপনার পুত্রলাভ হবে।"

রাজা বললেন—"বেশ, তা'হলে আদেশ করুন, আমি যজ্ঞের আয়োজন করি।"

মুনি-ঋষিরা বললেন—"মহারাজ, এ যজ্ঞ তপোবনে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আমরা সেইখানেই এ যজ্ঞ করব।"

রাজা বললেন—"বেশ, তাই হবে, আপনাদের যা-কিছু প্রয়োজন তাই আমি দেব। যজ্ঞ যাতে ভালভাবে সমাপ্ত হয় ও ঠিকমত ফল পাওয়া যায় আপনারা সে চেষ্টা করবেন।"

ঋষিরা রাজাকে আশীর্বাদ করে যজ্ঞের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন রাজাকে তা জানিয়ে বনে চলে গেলেন।

দুই-এক দিন পরে রাজা খবর পেলেন বনেব মধ্যে যজ্ঞ চলছে। এদিকে রাজা আর ধৈর্য ধরতে না পেরে চুপিচুপি

জলের পাত্র থেকে সবটুকু জল খেয়ে ফেললেন [২৮ পৃঃ]

বনের মধ্যে একলা গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেইদিনই সবে যজ্ঞ শেষ হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের পর ঋষিরা সকলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ে রাজা গিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

পথশ্রমে রাজার খুব পিপাসা পেয়েছিল। তিনি দেখলেন যজ্ঞকুণ্ডের পাশে ঋষিদের মাথার কাছে একটা জলভর্তি পাত্র রয়েছে। তিনি তখন কাউকে না জাগিয়ে সেই জলের পাত্র থেকে সব জলটুকু খেয়ে ফেললেন। তারপর ঋষিদের জাগাতেই তারা উঠে রাজাকে দেখে খুবই আনন্দ প্রকাশ করে বললেন—"মহারাজ, আজ অতি শুভক্ষণে আপনি এখানে এসেছেন, একটু আগেই যজ্ঞ শেষ হয়েছে, আপনি এইবার এই জলপাত্রটি নিয়ে যান। এই পাত্রের সব জল রাণীকে খেতে বলবেন।"

এই কথা বলে তাঁরা রাজার হাতে জলপাত্রটি দিতে গিয়ে দেখেন তাতে একফোঁটাও জল নেই। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁরা বললেন—"এ কি আশ্চর্য কাণ্ড! পাত্রের মন্ত্রপূত জল কোথায় গেল?"

রাজা ঋষিদের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—"আমি না জেনে এই জল খেয়ে ফেলেছি। আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল, এখানে এসে দেখলাম পাত্রে জল রয়েছে। তাই আপনাদের জাগরিত না করেই সেই জলটুকু সব খেয়ে ফেলেছি।"

ঋষিরা রাজার কথা শুনে সকলে 'হায় হায়' করে উঠলেন। তাঁরা রাজাকে বললেন—"মহারাজ! এ কি করেছেন আপনি,

ঐ জল যে মন্ত্রপূত ছিল। ঐ জল পান করলে রাণীর পেটে আপনার পুত্র জন্মগ্রহণ করত! এখন আর উপায় কি! এই মন্ত্রপূত জলের শক্তি রোধ করে এ জগতে এমন কেউ নেই। এখন রাণীর পরিবর্তে আপনার পেটেই আপনার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।"

রাজা শুনে মহা ভীত হয়ে পড়লেন। ঋষিদের চরণ ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি জানালেন, কিন্তু ঋষিদের ঐ এক কথা—এর শক্তি রোধ করতে জগতে কেউ নেই!

রাজা তখন অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে রাজধানীতে ফিরে গেলেন; কিন্তু আর রাজসভায় গেলেন না। তিনি খুব অসুস্থ এই কথা রাজ্যে প্রচার করা হল। রাজান্তঃপুরের একটি ঘরে তিনি গোপনে বাস করতে লাগলেন।

এই ভাবে দশমাস দশদিন কেটে যাবার পর রাজবৈদ্যকে ডাকিয়ে রাজার পেট কেটে পুত্রটিকে বার করা হল। রাজবৈদ্যের চিকিৎসার গুণে রাজা অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল রাজার এই ছেলে কার দুগ্ধ পান করে বেঁচে থাকবে! তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে নেমে এসে বললেন—"এরূপ ঘটনা বিশ্বে আর কখনও দেখা যায় নি। তাই আমি স্বয়ং স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি আপনার এই পুত্রটিকে রক্ষা করবার জন্য। আমি দৈববলে একে দুগ্ধ পান করাব। আমারই জন্য এ বাঁচবে—মাং ধাতা।"

এই কথা বলে ইন্দ্র শিশুর মুখে তাঁর বুড়ো আঙুলটি চেপে ধরলেন। দৈববলে সেই আঙুল থেকে অনবরত দুধের ধারা

প্রবাহিত হতে লাগল। আর সেই দুধ খেয়ে শিশুটি বেঁচে রইল।

ইন্দ্রের মুখে উচ্চারিত 'মাং ধাতা' এই কথা থেকেই রাজার ছেলের নাম রাখা হল মান্ধাতা।

ক্রমে মান্ধাতা বড় হলেন, রাজা যুবনাশ্ব এবার তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। মান্ধাতা তখন সম্রাট হয়ে সমগ্র দেশ শাসন করতে লাগলেন।

অভিশপ্ত রাজা

নহুষ রাজা খুব বড় রাজা। প্রকাণ্ড তাঁর রাজ্য, প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ।

নহুষ রাজার ছয় ছেলে—যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি।

রাজার বড় ছেলে যতির ধর্মের দিকে মন খুব। তাই তিনি বললেন—"আমি রাজা হয়ে বিলাসে মগ্ন থাকতে চাই না। এতে আমার ধর্মের হানি হবে। আমি তপস্যা করেই জীবন কাটাতে চাই।"

রাজা নহুষ তখন যযাতিকেই রাজসিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন।

যযাতি রাজা হয়ে সুশাসনের দিকে মন দিলেন। কিন্তু মৃগয়া করা তাঁর খুব শখ। তাই মাঝে মাঝে বনে যেতেন।

যযাতির পাঁচটি ছেলে। তাদের নাম যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। তারাও ক্রমশঃ বড় হতে লাগল।

যযাতি রাজকার্য করেন আর বনে মৃগয়া করতে যান। যযাতির দুই রাণী। এক হলেন শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানী, অন্যটি হলেন রাজা বৃষপর্বের মেয়ে শর্মিষ্ঠা।

ক্রমশঃ রাজা যযাতি বার্ধক্যে পা দিলেন। জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে রাজ্যশাসন করা আর বনে বনে মৃগয়া করে

বেড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। তিনি তখন মুনি-ঋষিদের স্মরণ নিলেন। মুনি-ঋষিরা বললেন—"মহারাজ, আপনার এ বার্ধক্য অকাল-বার্ধক্য। নিশ্চয় কেউ আপনাকে কোন অভিশাপ দিয়েছে। তা না হলে আপনি অকালে এমন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন কেন?"

রাজা তখন মুনি-ঋষিদের বললেন—"আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন। আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে এক মহা অপরাধ করেছিলাম। তাই তিনি আমাকে অকালে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। এখন আপনারা এর একটা বিহিত করুন।"

তখন মুনি-ঋষিরা বললেন—"আমরা শুক্রাচার্যের অভিশাপ কিছুতেই খণ্ডন করতে পারি না, তবে আমরা তপস্যাবলে এইটুকু করতে পারি যে অন্য কেউ যদি আপনার জরা গ্রহণ করে তার যৌবন আপনাকে দেয়, তবেই আপনি কিছু-দিনের জন্য জরা থেকে মুক্ত হতে পারেন। আবার আপনি তাকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে যখন ইচ্ছা আপনার জরা গ্রহণ করতে পারেন।"

ঋষিদের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে তাঁদের তপস্যাবলে সেই শক্তি লাভ করে রাজা তখন একে একে পাঁচ ছেলেকে ডাকলেন। বড় ছেলে যদুকে বললেন—"তুমি কিছুদিনের জন্য তোমার যৌবন আমাকে দাও, আর আমার জরা তুমি নাও।"

যদু বাপের দিকে চেয়ে তাঁর জরাগ্রস্ত শরীর দেখে ভয় পেয়ে বললে—"না বাবা, আমি আপনার জরা নিতে পারব না।"

যযাতি বললেন—"বেশ, তোমাকে আমি কোনও দিন রাজসিংহাসনে বসাব না।"

তারপর তিনি ডাকলেন মেজ ছেলে তুর্বসুকে।

তুর্বসুও বাপের কথায় ঠিক যদুর মতই উত্তর দিলে, রাজা রেগে উঠে তাকেও সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন, তাঁর সেজ ছেলে দ্রুহ্যকে। তারও মুখে শুনলেন ঐ একই উত্তর। তিনি তাকেও দিলেন সেখান থেকে তাড়িয়ে। তারপর তিনি ডাকলেন তাঁর চতুর্থ ছেলে অনুকে। অনু বাপের কথা শুনে একটু রেগে উঠে বললে—"আমি আপনার জরা নিয়ে কষ্ট ভোগ করব কেন বাবা? আমি তা পারব না।"

রাজা তখন তাকে খুব ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলেন।

এবার তিনি ডাকলেন সব চেয়ে ছোট ছেলে পুরুকে। তারপর তাকে বললেন—"দেখ পুরু, তুমি আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। আমার শেষ অবলম্বন। আমি জরাগ্রস্ত হয়ে নানা কষ্ট পাচ্ছি। আমার আরও কিছুদিন এ পৃথিবীতে সুখভোগ করবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু জরাগ্রস্ত শরীর নিয়ে আমি তা পারি না। এজন্য আমি মুনি-ঋষিদের কাছে আমার দুঃখের কথা বলায় তাঁরা আমাকে এই আশীর্বাদ করেছেন যে, কেউ যদি তার যৌবন আমাকে দেয় ও আমার জরা নেয় তবেই আমি কিছুদিন রাজসুখ ভোগ করতে পারি। তুমি যদি আমার জরা নিয়ে তোমার যৌবন আমাকে দাও তা'হলে আমি পরম সুখী হই।"

রাজা যযাতির কথা শুনে পুরু করযোড়ে বললে—"বাবা, আপনার কৃপাতেই আমার জীবন। এ শরীর আপনি আমায় দান করেছেন। এখন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার জরা আমাকে দিয়ে আমার যৌবন গ্রহণ করুন। আমি আনন্দিত মনে আমার যৌবন আপনাকে দিলাম।"

রাজা যযাতি পুরুর কথা শুনে আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"তুমিই যথার্থ পুত্রের কর্তব্য পালন করেছ। আমার পরে তুমি রাজসিংহাসনে বসবে। তোমার মত পুত্র পাওয়া আমারও পরম ভাগ্য।"

পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে আনন্দচিত্তে তাঁর জরা গ্রহণ করল ও নিজের যৌবন তাঁকে দিল।

এই ভাবে রাজা যযাতি যৌবন ফিরে পেয়ে মনের আনন্দে রাজ্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। আর পুরু জরাগ্রস্ত হয়ে রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে বসে ধর্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করল।

বছরের পর বছর কাটতে লাগল, যযাতি এবার বুঝলেন ভোগের শেষ নেই। যতই কেন ভোগ করা যায় আবার ভোগ করবার ইচ্ছা হয়। আগুনে যতই ঘি দেওয়া যায়, অগ্নির তেজ ততই বাড়ে। কামনার আগুনে যতই ভোগরূপ ঘি পড়ুক না কেন, কামনার আগুন না নিভে ততই জ্বলে উঠে। তবে আর কেন এ ভোগ? এই ভেবে রাজা যযাতি পুরুকে ডেকে পাঠালেন।

জরাগ্রস্ত পুরু অতিকষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে রাজা যযাতির সামনে এসে দাঁড়াল। পুত্রের সেই অবস্থা দেখে যযাতির মনে

দারুণ অনুতাপ হল। তিনি তখনি পুরুকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে আবার নিজের জরা তার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন।

এবার রাজা যযাতি পুরুকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন গভীর বনে তপস্যা করতে।

সারা জগতে পুরুর পিতৃভক্তির কথা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে রইল।

লক্ষ্মীর স্বর্গলাভ

হিমালয় পর্বতে এক বিদ্যাধরী সন্তানক ফুলের একগাছি মালা গেঁথে উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিল। মহর্ষি দুর্বাসাও পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে সেই পথ দিয়ে ফিরছিলেন।

বিদ্যাধরীর হাতে সন্তানক ফুলের সেই অপূর্ব মালাগাছি দেখে দুর্বাসার খুব লোভ হল। তিনি বিদ্যাধরীকে বললেন—"চমৎকার মালাগাছি ত! তুমি এ দেবভোগ্য সন্তানক ফুল পেলে কোথায়?"

বিদ্যাধরী উত্তর দিল—"আমি হিমালয় পর্বতের পুষ্পোদ্যান থেকে পেয়েছি। আর তারই মালা গেঁথে আমি আমার স্বামীকে দিতে যাচ্ছি।"

দুর্বাসা বললেন—"এ হল দেবতাদের উপযুক্ত মালা। তুমি এ মালাগাছি আমাকে দাও।"

বিদ্যাধরী তখন প্রণাম করে দুর্বাসার হাতে সেই সন্তানক ফুলের মালা দিল। দুর্বাসা বিদ্যাধরীকে আশীর্বাদ করে সেই মালা নিজের মাথায় জড়িয়ে নিয়ে স্বর্গের দিকে চলতে লাগলেন। স্বর্গে পৌঁছবার পর তিনি দেখতে পেলেন ইন্দ্র তাঁর হাতী ঐরাবতে চড়ে সেই দিকে আসছেন। দুর্বাসা তখন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সেই মালা ইন্দ্রের হাতে দিলেন। ইন্দ্র সেই মালা নিজে না পরে তাঁর ঐরাবতের মাথায় রেখে দিলেন। ঐরাবতও শুঁড় দিয়ে

সেই মালাটি তার মাথা থেকে টেনে নিয়ে পা দিয়ে পিষে ফেললে।

দুর্বাসা তখন ইন্দ্রের কাণ্ড দেখে খুব রেগে উঠে বললেন—"ওহে দেবরাজ, তোমার দেখছি বড় অহঙ্কার হয়েছে। আমি তোমাকে সম্মান করে মালা দিলাম আর তুমি সে মালা হাতীকে দিয়ে মাটিতে পিষে ফেললে! তুমি স্বর্গের রাজা হয়ে ভাবছ তোমার ঐশ্বর্যের সীমা নেই। কিন্তু আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার এ ঐশ্বর্য থাকবে না। তোমার স্বর্গ থেকে লক্ষ্মী চলে যাবেন। আর স্বর্গের ঐশ্বর্য সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ইন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি হাতী থেকে নেমে তাঁকে ক্ষমা করবার জন্য দুর্বাসাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না; দুর্বাসা ভয়ানক রেগেই সেখান থেকে চলে গেলেন।

এদিকে ইন্দ্র তাঁর নন্দনবনে ফিরে এসে দেখেন সেখানকার সব পারিজাত ফুল না ফুটেই ঝরে ঝরে পড়ছে। তাঁর প্রাসাদে ফিরে গিয়ে দেখেন সব যেন শ্রীহীন হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন দুর্বাসার শাপে স্বর্গ ছেড়ে লক্ষ্মী চলে গেলেন।

সত্যই তাই হল। লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে চলে যাওয়াতে দেবতাদের আর সে ক্ষমতা রইল না। তাঁরা যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ ও বলহীন হয়ে পড়লেন।

দৈত্যেরা দেবতাদের চিরশত্রু। তারা যখন শুনল দেবতারা ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে তখন তারা স্বর্গ আক্রমণ করার সঙ্কল্প করল।

তাদের এ সঙ্কল্পের কথা শুনে দেবতারা সকলে ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন—"দৈত্যদের আটকানো আমার কর্ম নয়। তোমরা যাও বিষ্ণুর কাছে।"

দেবতাদের সব কথা শুনে বিষ্ণু বললেন—"তোমরা ক্ষমতাহীন হলে ত চলবে না। যাতে শরীরে আবার নতুন শক্তি ফিরে পাও তার চেষ্টা কর।"

দেবতারা তখন বিষ্ণুকে বললেন—"আপনি বলে দিন আমরা কি করে আবার হারানো শক্তি ফিরে পাব।"

বিষ্ণু হেসে বললেন—"এই ক্ষীরসমুদ্রের অতলে আছে অমৃত-ভাণ্ড। সমুদ্রমন্থন করে তোমরা অমৃত-ভাণ্ড তুলে এনে অমৃত খেতে আরম্ভ করলে আবার তোমাদের হারানো শক্তি ফিরে পাবে।"

দেবতারা তখন সমুদ্রমন্থনের সব কথা জেনে নিয়ে দৈত্যদেরও সে কথা জানিয়ে দিলেন।

দৈত্যেরা ভাবলে, শুধু দেবতারা যে অমৃত-ভাণ্ড পাবে তাই বা কেমন করে হবে! আমরাই বা বাদ যাব কেন?

এই কথা ভেবে দৈত্যেরাও দেবতাদের সঙ্গে সমুদ্রমন্থনে যোগ দিল।

মন্দর পর্বত হল মন্থনদণ্ড। আর বাসুকি সাপ হল মন্থনরজ্জু। এই ভাবে চলল সমুদ্রমন্থন। কিন্তু একটা বড় ভুল করে বসল দৈত্যেরা। তারা ধরেছিল বাসুকির মুখের দিক্‌টা, আর দেবতারা ধরেছিলেন লেজের দিক্। এতে কিন্তু ফল হল দৈত্যদের পক্ষে খারাপ, কারণ বাসুকির বিষাক্ত

নিঃশ্বাস গায়ে লেগে দৈত্যেরা ক্রমশঃই নির্জীব হয়ে পড়ল। কিন্তু মন্থন চলতে লাগল।

অনেক কিছু পাওয়া গেল ক্ষীরসমুদ্রের ভেতর থেকে। শেষে ধন্বন্তরী উঠলেন অমৃতের কলসী নিয়ে, তারপর সর্বশেষে উঠলেন লক্ষ্মীদেবী।

লক্ষ্মী দেবতাদের দলে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁদের মনে হল যেন তাঁরা শক্তি ফিরে পেয়েছেন। এদিকে দৈত্যেরা যখন দেখলে ধন্বন্তরীও অমৃতের কলসী নিয়ে দেবতাদের দিকে চলেছেন, তখন তারা ছুটে গিয়ে সেই কলসী কেড়ে নিতে গেল। তখন দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে আবার মারামারি হবার যোগাড় হল।

বিষ্ণু দেখলেন গতিক বড় খারাপ। তখন তিনি তাড়াতাড়ি একটি সুন্দরী মেয়ের মোহিনী মূর্তি ধরে দৈত্যদের সামনে নৃত্যগীত শুরু করে দিলেন।

দৈত্যেরা বিষ্ণুর নৃত্যগীতে এমনি মুগ্ধ হয়ে গেল যে, অমৃতের কলসীর কথা তাদের আর মনে রইল না। সেই সুযোগে বিষ্ণু মোহিনী মূর্তিতেই অমৃতের কলসী নিয়ে সরে পড়লেন। দৈত্যেরা তখন দেবতাদের চাতুরী বুঝতে পেরে দেবতাদের আক্রমণ করতে গেল। কিন্তু, দেবতারা তখন নব বলে বলীয়ান, দৈত্যেরা তাঁদের সঙ্গে পারবে কেন? তারা শেষে স্বর্গের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

দেবতারা তখন আবার লক্ষ্মীকে ফিরে পেয়েছেন, লক্ষ্মীর পুনরায় স্বর্গলাভ হল।

সৌবীর রাজার কাহিনী

মহানদীর তীরে শালগ্রাম বনে হরিণ-হরিণীরা নির্ভয়ে বিচরণ করত। সে বনে হিংসা ছিল না, ছিল শুধু আনন্দ আর স্বেচ্ছায় বিচরণ। এই ভাবে অনেক দিন কাটল।

রাজা ভরত দীর্ঘকাল রাজত্ব করে পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। আর শালগ্রাম বনে এসে আশ্রম বেঁধে ভগবানের ধ্যান করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন সেই বনে এক সিংহ এসে উপস্থিত হল। অত হরিণ-হরিণী দেখে সে ভাবল ঃ বাঃ এখানে ত চমৎকার খাবারের যোগাড় আছে। এই ভেবে সে একটি হরিণীকে তাড়া করল। হরিণী ছিল গর্ভবতী। তাই তাড়াতাড়ি একটা উঁচু জায়গায় উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেল নদীর জলে। যেখানে রাজা ভরত স্নান করছিলেন হরিণী ঠিক সেইখানেই জলে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বাচ্চা প্রসব করে মরে গেল। রাজা ভরত তখন দয়ার্দ্রচিত্তে সেই হরিণের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন।

সেইদিন থেকে পরম যত্নে তিনি বাচ্চাটিকে লালন-পালন করতে লাগলেন। নিজের হাতে তাকে দুধ খাওয়াতেন, কচি কচি পাতা তার মুখের কাছে ধরে দিতেন আর রাত্রে নিজের বিছানায় তাকে যত্ন করে শুইয়ে কত আদর করতেন।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগল।

রাজা ভরত হরিণের বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলেন

হরিণশিশু যখন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত রাজা ভরত তার দিকে চেয়ে থাকতেন; পাছে কোন বন্য জন্তু এসে সেই হরিণশিশুকে আক্রমণ করে এজন্য তিনি খুবই সতর্ক থাকতেন। শেষে এমন অবস্থা হল যে হরিণশিশুকে নিরাপদ না দেখে তিনি কোন কাজে মন দিতে পারতেন না।

এই ভাবে শয়নে-স্বপনে, চিন্তায়-জাগরণে রাজা ভরত সেই হরিণশিশুর কথাই ভাবতেন।

ক্রমে একদিন রাজা ভরতের মৃত্যুসময় এল। তিনি হরিণশিশুটির গলা জড়িয়ে ধরে তারই কথা ভাবতে ভাবতে চিরনিদ্রায় চোখ বুজলেন।

মৃত্যুকালে হরিণের কথা ভাবাতে রাজা ভরতকে পরজন্মে হরিণরূপেই জন্মগ্রহণ করতে হল।

হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে রাজা ভরতের মৃত্যু হল বলে পরজন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে অনেক বন অতিক্রম করে সেই শালগ্রাম বনে ফিরে এলেন। কালক্রমে মৃত্যু এসে এবার তাঁর হরিণজন্মও ঘুচিয়ে দিল।

পরবর্তী জন্ম হল তাঁর এক ব্রাহ্মণের ঘরে। কিন্তু পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা তাঁর ঠিক মনে রইল। তিনি ভাবলেন, মরণকালে যার কথা চিন্তা করা যায় পরজন্মে যদি সেই রকম রূপ ধরতে হয় তা'হলে ভগবানের চিন্তা করাই ভাল। তাই তিনি ভগবানের ধ্যান-ধারণাতেই দিন কাটাতে লাগলেন, সংসারের কোন চিন্তার মধ্যে রইলেন না। তিনি চুপ করে

এক জায়গাতে বসে থাকতেন। কারোর সঙ্গে কথাও বলতেন না। তাঁর এই রকম কাণ্ড দেখে সকলে তাঁর নাম দিল জড়ভরত।

যখন তাঁর বাপ-মা মারা গেলেন তখন থেকে আরম্ভ হল তাঁর দুর্দশার জীবন। তাঁর ভায়েরা ও ভ্রাতৃবধূরা তাঁর ওপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করল। তিনি নীরবে সেসব সহ্য করতেন।

একদিন জড়ভরত বনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল এক সুন্দর পাল্কী সেই দিকে আসছে। সেই পাল্কীতে সৌবীর রাজা আসছিলেন। তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল কপিল মুনির আশ্রম। কিন্তু তাঁর পাল্কীর একজন বাহক অসুস্থ হয়ে পড়ায় একজন বাহকের বিশেষ দরকার ছিল। আর সেই বনের পথে বাহকই বা পাওয়া যায় কোথায়! তাই সামনে জড়ভরতকে দেখে তাঁকেই বাহক নিযুক্ত করলেন। জড়ভরত ঘাড় নেড়ে পাল্কীর বাহক হয়ে যেতে সম্মত হলেন।

কিছুদূর যাবার পর পাল্কী টলতে লাগল। রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন—"পাল্কী এমন টলছে কেন? রাস্তা কি ?"

বাহকেরা বললে—"না মহারাজ, এই নতুন লোকটি ঠিকমত চলতে পারছে না, তাই পাল্কী এমন টলছে।"

রাজা তখন জড়ভরতকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ পাল্কী বইতে কি তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? আমার ভার কি বেশি?"

জড়ভরত বললেন—"না, মহারাজ, আপনার ভার বেশি হতে যাবে কেন ? এ জগতে যিনি সকলের ভার বইছেন তিনিই সে ভার অনুভব করবেন, আমরা কেন করব ? আমাদের সকলের উপরে তাঁর সমান দৃষ্টি। তাই সকলের ভার তিনিই একা বহন করেন।"

একজন সামান্য বাহকের মুখে এরূপ জ্ঞানের কথা শুনে রাজা খুব আশ্চর্য হলেন। তখনি তিনি পাল্কী থেকে নেমে পড়ে জড়ভরতের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"আপনি ত সামান্য লোক নন, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি। এখন আপনি আপনার পরিচয় দিন, আপনি কে ?"

জড়ভরত তখন মৃদু হেসে বললেন—"মহারাজ, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। এ প্রশ্নের উত্তর আমি কেমন করে দেব ? আমি এই জন্মে যে রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, তার আগের জন্মে আমার ত সে রূপ ছিল না। তারও পূর্বজন্মে আমার অন্যরূপ ছিল। সুতরাং প্রত্যেক জন্মে আমার পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি আজ রাজা, পূর্বজন্মে আপনি কি ছিলেন তা' কে জানে ? আর পরজন্মে আপনি কি হবেন সে কথাও এখন কেউ বলতে পারে না। এই যে পাল্কী দেখছেন, এটা এর বর্তমান রূপ। এর আগে এ ছিল কাঠ, তার আগে ছিল গাছ, তার আগে ছিল বীজাঙ্কুর। সব মিলিয়ে দেখলে কোন্‌টা যে এর আসল মূর্তি—সে কথা কে বলতে পারে! চোখের সামনে যে রূপ দেখছি সেটা একটা মায়া। সেই মায়ার মধ্য দিয়ে কত রূপই উঁকি মারছে! মহারাজ, তাই আপনার

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কেমন করে দেব ? কি করে বলব আমি কে ?”

রাজা জড়ভরতের কথা শুনে বললেন—“মহাশয়, আমি যাচ্ছিলাম কপিল মুনির কাছে কিছু জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য। কিন্তু এখন দেখছি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আপনার কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা শুনতে পেলাম।”

তখন জড়ভরত রাজাকে বললেন—“মহারাজ, এ জগতে ভগবানের কাছে কোন ভেদাভেদ নেই, সামান্য কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত সবই তাঁর কাছে এক। সকলের মধ্যেই তাঁর আত্মা বিরাজ করছে—তাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আত্মার বিনাশ নেই, আত্মার জন্ম নেই, আত্মার ক্ষয় নেই। এই আত্মাই ভগবানের আত্মা,—তাঁরই আসন সকল জীবের মধ্যে।”

রাজা জড়ভরতের কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে প্রণাম করে নিজের রাজপ্রাসাদে গুরুরূপে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু জড়ভরত গেলেন না। রাজাকে আশীর্বাদ করে আবার গহন বনে চলে গেলেন তপস্যার জন্য।

মণি নিয়ে কাণ্ড

'যে দেবতাকে রোজ চোখের সামনে দেখা যায়, যাকে আকাশে চলাফেরা করতে দেখি, যার করুণা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে ফলে ফুলে পাতায়, যার কৃপায় নদ-নদী-সমুদ্রের জল আকাশে মেঘ হয়ে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে সেই দেবতারই আরাধনা করব আমি।'—এই কথা ভেবে সমুদ্রের তীরে বসে সত্রাজিৎ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল সূর্যদেবের।

সত্রাজিতের তপস্যা দেখে সূর্যদেব একদিন তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সত্রাজিৎ বললে—"প্রভো, যদি কৃপা করে আমার সামনে এসেছেন, তবে আপনার ঐ গোলাকার উজ্জ্বল রূপ ছেড়ে আপনার আসল রূপটি দেখান।"

সূর্যদেব তখনি তাঁর গলা থেকে একটি হার খুলে ফেললেন, এই হারে ছিল স্যমন্তক মণি। যেমন সেই মণি সূর্যদেব খুলে রাখলেন তখনি প্রকাশ পেল তাঁর আসল রূপ। সেই আসলরূপ দেখে সত্রাজিৎ বার বার প্রণিপাত করে সূর্যের স্তবস্তুতি করতে লাগল।

সূর্যদেব বললেন—"আমি তোমার তপস্যা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, এখন তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।"

এই কথা শুনে সত্রাজিৎ বললে—"প্রভো, আমাকে আপনার ঐ মণিটি দিন।"

সূর্যদেব বললেন—"এ মণির নাম স্যমন্তক মণি। কিন্তু এটি তোমার প্রার্থনামত তোমাকেই দান করলাম। এটিকে খুব সাবধানে রাখবে। প্রতিদিন আট কলসী সোনা পাবে এই মণি থেকে।"

এই কথা বলে সূর্যদেব সত্রাজিৎকে মণিটি দিয়ে আবার নিজের গোলাকার রূপ ধরে আকাশে উঠে গেলেন।

সত্রাজিৎ তখন সেই মণিটি গলায় পরে দ্বারকায় ফিরে এল।

সেই মণির উজ্জ্বলতা দেখে সকলে অবাক্ হল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সকল কথা শুনে সে মণিটি দেখে ভাবলেন ঃ এ যেকালে সূর্যদেবের কাছ থেকে পাওয়া মণি, তা'হলে নিশ্চয়ই এটা স্যমন্তক মণি। এ মণি অতি আশ্চর্য বস্তু। সত্রাজিৎ একে নিয়ে কি করবে, তার চেয়ে এটা আমার কাছে থাকাই ভাল। আর প্রকৃতপক্ষে সত্রাজিতের কাছে এটা থাকা উচিত নয়। আমার কাছে থাকলে এটা নিরাপদে থাকবে।

এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বললেন—"দেখ সত্রাজিৎ, এ মণি আমার কাছে থাক, আমি একে ভাল করে সাবধানে রাখব। তোমার কাছে থাকলে এটা চুরি যাবার সম্ভাবনা বেশি।"

সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে ভাবলে ঃ এ বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের একটা কৌশল। তাই তখন শ্রীকৃষ্ণকে কোন কথা না বলে সেই মণিটি তার ভাই প্রসেনকে রাখতে দিলে।

প্রসেনের ছিল মৃগয়ার খুব ঝোঁক। সে সেই মণিটি গলায় পরেই বনে শিকার করতে গেল। বনের মধ্যে শিকারের

সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে প্রসেন হঠাৎ এক সিংহের সামনে পড়ল। কিন্তু সিংহকে বধ করবার আগেই সিংহ লাফিয়ে পড়ল প্রসেনের ঘাড়ে। প্রসেন তখনি মাটিতে পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়ে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আগেই সিংহ আবার আক্রমণ করল তাকে। এবার প্রসেন সিংহের আক্রমণে নিহত হল। আর তার গলার মণিটি ছিট্‌কে পড়ল মাটির উপর।

সিংহ দেখলে একটা উজ্জ্বল জিনিস সেখানে পড়ে রয়েছে। সে যখন তার থাবা দিয়ে মণিটি নাড়াচাড়া করছে এমন সময় ভল্লুকদের রাজা জাম্বুবান সেখানে এল। জাম্বুবান সিংহকে দেখে প্রবলবেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিংহ সে আক্রমণ সহ্য করতে পারল না, জাম্বুবানের হাতে নিহত হল। জাম্বুবান তখন মণিটিকে দেখে সেটি তুলে নিয়ে চলে গেল তার গুহার দিকে।

এদিকে প্রসেন মৃগয়া থেকে ফেরে না দেখে সত্রাজিৎ মহাচিন্তায় পড়ল। সে তখনি শ্রীকৃষ্ণকে সব কথা বলে তাঁর সাহায্য চাইল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর দলবল নিয়ে বনের মধ্যে গেলেন প্রসেনের খোঁজে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তিনি দেখলেন প্রসেনের গলিত মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি সেই মৃতদেহ ও তার পাশে সিংহের থাবার দাগ দেখতে পেয়ে ঠিক করলেন যে প্রসেনকে সিংহ হত্যা করেছে। তখন তিনি সেই সিংহকে মারবার জন্য তার পদচিহ্ন ধরে আরও এগিয়ে গেলেন।

কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখেন সিংহটাও মরে পড়ে আছে। একটু আশ্চর্য হয়ে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করতে লাগলেন কে এই সিংহকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবিষ্কার করলেন ভল্লুকের পদচিহ্ন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ভল্লুকই সিংহকে বধ করেছে। কিন্তু এ ত সাধারণ ভল্লুক নয় যে এত বড় একটা সিংহকে বধ করতে পারে। তাই তিনি ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আরও এগিয়ে গেলেন। শেষে দেখতে পেলেন এক গুহার কাছে গিয়ে পদচিহ্ন শেষ হয়েছে। তখন তিনি ঠিক করলেন এই গুহার মধ্যে নিশ্চয় সেই ভল্লুক আছে। তখন তিনি গুহার মধ্যে ঢুকবার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গের লোকজন তাঁকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে নিষেধ করল, কিন্তু তিনি তাদের গুহার বাইরে বনের মধ্যে অপেক্ষা করতে বলে একাকী সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গুহায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন চমৎকার সাজানো গুহা। তখন তাঁর মনে হল এটি নিশ্চয় ভল্লুকের রাজা জাম্বুবানের বাড়ী। তা নইলে সিংহকে বধ করবার ক্ষমতা কোন সাধারণ ভল্লুকের হয়? তিনি এ সব ভাবছেন হঠাৎ ছোট বাচ্চার ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন সেই গুহার এক স্থানে বসে একটি চমৎকার ভল্লুকের বাচ্চা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর একটি বড় ভল্লুকী তাকে নানা ভাবে ভোলাবার চেষ্টা করছে। তিনি দেখলেন সেই ভল্লুকী শেষে একটা মণি বার করে বাচ্চাকে দিতে

গেল। সেই মণির আভায় সমস্ত গুহা যেন আলোকিত হয়ে উঠল। সেই ভল্লুকী বাচ্চার ধাত্রী।

এবার শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিটিকে দেখে চিনতে পারলেন যে সেটি স্যমন্তক মণি। সেই ভল্লুকী শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বাচ্চাকে বুকে তুলে নিয়ে মণিটিকে বাচ্চার হাতে দিয়ে তখনি ছুটে চলে গেল ভিতরের আর একটি গুহায়।

শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছেন এমন সময়ে একটা বিকট হুঙ্কার শুনে চেয়ে দেখেন ভল্লুকদের রাজা জাম্বুবান তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার রক্তবর্ণ চোখ, বিকট দাঁত ও উদ্যত থাবা দেখে তিনি বুঝলেন জাম্বুবান তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। তিনিও প্রস্তুত ছিলেন। তখনি সেই গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্বুবানের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল।

শ্রীকৃষ্ণ যতটা সহজে জাম্বুবানকে পরাজিত করবেন ভেবেছিলেন ততটা সহজে জাম্বুবানের পরাজয় হল না। জাম্বুবান ভীষণভাবে লড়তে লাগল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। দিনের পর দিন সেই যুদ্ধ চলতে লাগল। কেউ হারে না।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের লোকজন যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল তারা ভাবল নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, তা' না হলে এতদিন তিনি কেন গুহার মধ্যে থাকবেন ? এই ভেবে তারা সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে সাহসী না হয়ে দ্বারকায় ফিরে গিয়ে সকলকে বললে যে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে।

এই কথা শুনে দ্বারকায় সকলে হাহাকার করে উঠল।

শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্বুবানের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল

কিন্তু উপায়ই বা কি! তখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধ করবার আয়োজন করতে লাগল সকলে। যথাসময়ে শ্রাদ্ধ আরম্ভ হল।

এদিকে গুহার মধ্যে তখনও শ্রীকৃষ্ণ আর জাম্বুবানে ঘোরতর লড়াই চলছে। দু'জনের আহার বন্ধ, শুধু লড়াই আর লড়াই। না খেতে পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। ঠিক এমন সময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তাঁর শ্রাদ্ধ করবার আহার্য ও পানীয় দ্রব্যগুলো নিবেদন করা হল। সেই মন্ত্রপূত শ্রাদ্ধের দ্রব্য অলক্ষ্যে এসে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে নববল প্রদান করল। মনে হল শ্রীকৃষ্ণ যেন পেট ভরে খেয়ে নিলেন, আর তাঁর শক্তিও যথেষ্ট বেড়ে গেল।

এখন আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে জাম্বুবান পারবে কেন? তাই সে পরাজিত হল শ্রীকৃষ্ণের হাতে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জাম্বুবানকে বললেন—"এখন তুমি পরাজিত হয়েছ, আমি যা চাই তা' আমাকে দাও।"

জাম্বুবান বললে—"আমি বুঝেছি আপনি সাধারণ মানুষ নন, নিশ্চয়ই ভগবানের অবতার। তা না হলে আমাকে পরাজিত করতে পারে, এত শক্তি মানুষের নেই। আপনি ত মণিটি পাবেনই, তার সঙ্গে আপনাকে উপহার দিলাম আমার কন্যা জাম্বুবতীকে। একে আপনি বিয়ে করুন। আপনার সঙ্গে আমি আত্মীয়তা স্থাপন করে সৌভাগ্য লাভ করি।"

শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হলেন জাম্বুবতীকে বিয়ে করতে। তখন সেখানেই বিয়ে হল। বিয়ের পর জাম্বুবতী ও স্যমন্তক মণি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ফিরলেন দ্বারকায়।

সকলে ভেবেছিল শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় আর জীবিত নেই, কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সকলে আনন্দিত হল। শ্রীকৃষ্ণ তখন সত্রাজিৎকে কাছে ডেকে বললেন—"আমিই মণির লোভে তোমার ভাই প্রসেনকে বনের মধ্যে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করেছি এই কথা হয়ত তোমার মনে জেগেছিল। এখন তুমি জেনেছ যে, প্রসেনকে বধ করেছে এক সিংহ। সেই সিংহকে বধ করে ভল্লুকরাজ জাম্বুবান মণিটি গ্রহণ করে। আমি অনেক কষ্টে এই মণিটিকে উদ্ধার করে এনেছি জাম্বুবানের হাত থেকে। এখন তোমার মণি তুমিই নাও।"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সত্রাজিৎ বললে—"আমি তোমাকে মিথ্যা সন্দেহ করেছিলাম। এখন বেশ বুঝতে পারছি তোমার এ মণিতে লোভ নেই। আমাকে তুমি ক্ষমা কর শ্রীকৃষ্ণ।"

শ্রীকৃষ্ণ তখন মণিটি তার হাতে দিয়ে মৃদু হেসে বললেন—'এ দুর্লভ মণি খুব সাবধানে রেখে দিও। দেবতারাও এ মণি পাবার জন্য ছুটে আসতে পারে, নরলোক ত কোন্ ছার। এ মণি তুমি হাতছাড়া করো না।"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সত্রাজিৎ ভাবলে ঃ শ্রীকৃষ্ণ এত উদার এত মহৎ যে মণিটি নিজে নেবার কোন চেষ্টা না করে আমাকেই ফিরিয়ে দিলে! আমি এ উদারতার কী প্রতিদান দেব? আমি ভাবছি আমার মেয়ে সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে দি। তবু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় আত্মীয়তা হবে।

এই কথা ভেবে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে বললে—"দেখ শ্রীকৃষ্ণ,

আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে সত্যভামার বিয়ে দিতে চাই। তুমি যদি এতে সম্মত হও তবে আমি খুবই আনন্দিত হব।"

সত্রাজিতের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"আমি তোমার মেয়ে সত্যভামাকে বিয়ে করব এতে আর আমার সম্মতি না দেবার কারণ কি থাকতে পারে? আমি এখনই রাজী।"

শুভদিনে শুভক্ষণে সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে এক কাণ্ড ঘটল। সত্যভামাকে বিয়ে করবার জন্য তিনজন লোকের খুব আগ্রহ ছিল। তারা অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বিয়ে করাতে এরা তিনজন শ্রীকৃষ্ণের উপর আর সত্রাজিতের উপর খুব চটে গেল। তারা স্পষ্টই সত্রাজিৎকে এর প্রতিফল দেবে বলে শাসিয়ে গেল। তারপর এরা তিনজনে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে বললে—"দেখ, সত্রাজিৎ খুব খারাপ লোক। ও কিনা আমাদের তিনজনের মধ্যে কারোর সঙ্গে সত্যভামার বিয়ে না দিয়ে তার বিয়ে দিলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে! এর একমাত্র প্রতিশোধ হল, তুমি যদি সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যমন্তক মণিটা ছল করে আদায় করতে পার তবে খুবই ভাল হয়, তা' না হলে জোর করেই আদায় করতে হবে। এমন কি যদি তাকে হত্যা করতেও হয় তাতেও পশ্চাদ্‌পদ হলে চলবে না। আমরা দু'জনে মিলে তোমাকে সাহায্য করব।"

শতধন্বা এদের কথা শুনে ভাবলেঃ এরা ঠিক কথাই বলছে, সত্রাজিৎকে মেরে ঐ মণি নিতে হবে।

এই ভেবে সে এক সময় অতর্কিতভাবে সত্রাজিতের কাছে গিয়ে তাকে বধ করে স্যমন্তক মণিটি নিয়ে চলে এল।

এ সংবাদ শুনে সত্যভামা হাহাকার করে উঠলেন—"কি দুঃসাহস ঐ শতধন্বার। আমার বাবাকে বধ করে মণি কেড়ে নিয়ে আসে!" এই বলে সত্যভামা ছুটলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন হস্তিনায়। সত্যভামা খুব জোরে রথ চালিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে খবরটা দিতে গেলেন। পথে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার কাছ থেকে সব সংবাদ শুনে খুব রেগে গেলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে তখনি ছুটে এলেন দ্বারকায়।

শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন শুনে শতধন্বা প্রাণের ভয়ে আশ্রয় নিতে গেল কৃতবর্মার কাছে। কিন্তু কৃতবর্মা তাকে আশ্রয় দেওয়া ত দূরের কথা, তাকে তাড়িয়ে দিল নিজের বাড়ী থেকে। শতধন্বা তখন অক্রূরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু অক্রূর তার কোন কথা কানেই তুলল না।

শতধন্বা ভাবলেঃ তাই ত, যারা একদিন আমাকে সাহায্য করবে বলে কত সাহস দিয়েছিল এখন তারা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে আর আমাকে সাহায্য করতে রাজী হচ্ছে না। এখন আমি কি করি, আমার প্রাণ বাঁচানো ত বড়ই কঠিন হল দেখছি। কিন্তু মণিটি নিয়ে আমি কোথায় রাখব?

এই কথা ভেবে শতধন্বা আবার অক্রূরের কাছে গেল। অক্রূর তাকে দেখে খুব রেগে উঠল, কিন্তু শতধন্বা অক্রূরকে বলল—"দেখ, আমি ত শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে পালাতে চাই, কিন্তু এই স্যমন্তক মণিটি তুমি তোমার কাছে রেখে দাও, আমি ফিরে এসে যখন এটি চাইব, তখনি কিন্তু দিতে হবে।"

অক্রূর বললে—"বেশ ত, আমি রাজী, কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো। তুমি যে আমার কাছে মণি রেখে গেলে এ কথা কারোর কাছে বলবে না। কেমন স্বীকৃত হলে ?"

শতধন্বা আর কোন উপায় না দেখে তাতেই সম্মত হল। মণিটি এবার অক্রূরের হাতে গেল।

শতধন্বা মিথিলার দিকে পালিয়ে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ধরবার জন্য মিথিলার দিকে চললেন। পথে তাঁরা শতধন্বার দেখা পেলেন, কিন্তু শতধন্বা তাঁদের দেখেই ছুটতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বধ করলেন। স্যমন্তক মণিটি শতধন্বার দেহের কোথাও দেখা গেল না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি সম্বন্ধে নিরাশ হতে হল।

কিন্তু বলরাম ভাবলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় মণিটি নিজে লুকিয়ে রেখেছেন আর তাঁকে সে মণি দেখাচ্ছেন না। তখন বলরাম খুব রাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যত বলেন তিনি মণিটি পান নি, বলরাম তখন ভাবেন এ নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী। তাই বলরাম রাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আর দ্বারকায় না ফিরে অন্য দেশে চলে গেলেন।

এদিকে অক্রূর স্যমন্তক মণির প্রভাবে রোজই আট কলসী সোনা পেতে লাগল। অত সোনা নিয়ে সে ত বিব্রত। কিন্তু রাখবেই বা কোথায় ? শেষে কি লোক-জানাজানি হবে ? তাই অক্রূর ঠিক করলে এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে যথেষ্ট খরচ হয় অথচ সুনাম ও পরকালের কাজ হয়। অনেক ভেবে চিন্তে অক্রূর স্থির করলে, একটা বিরাট যজ্ঞ করবে।

এই ভেবে সে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগল, অনেক লোককে নিত্য আহার যোগাতে লাগল আর মুনিঋষি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে যথেষ্ট দান করতে লাগল। দেশশুদ্ধ লোক অক্রূরের যজ্ঞের ঘটা দেখে অবাক্। এত অর্থ অক্রূর পায় কোথা থেকে ! কিন্তু মুখ ফুটে কেউ অক্রূরকে কোন কথা বলতে পারল না। অক্রূর বুঝতে পারল যে লোকে তাকে নানা বিষয়ে সন্দেহ করছে, সে তখন যজ্ঞ শেষ করে দ্বারকা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে দেশে নানা রকম রোগ ও মড়ক দেখা দিল। অনাবৃষ্টির জন্য শস্যক্ষেত্র শুকিয়ে যেতে লাগল। তখন লোকে বলাবলি করতে লাগল যে অক্রূরের মা ছিলেন পুণ্যবতী। তাঁরই পুণ্য পেয়েছিল অক্রূর। সেই অক্রূর চলে যাওয়াতেই দেশের এ রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

তখন তারা সকলে পরামর্শ করে অক্রূরকে আবার দেশে ফিরিয়ে আনলে।

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বুঝলেন অন্য রকম। মায়ের পুণ্যফল যতই থাকুক, অক্রূর দেশ ছেড়ে গেলে অমনি দেশে নানা রকম কুলক্ষণ

দেখা দেবে, এ আবার কি রকম কথা! নিশ্চয়ই স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছে আছে। কৌশলে সেটা জানতে হবে।

তখন সকলের সামনে অক্রূরকে ডেকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"সত্য করে বল, স্যমন্তক মণি তোমার কাছে আছে কি না। শতধন্বা মণিটি তোমার কাছে রেখে গেছে একথা প্রকাশ পেয়েছে। তাই সেই স্যমন্তক মণির কথাই জিজ্ঞাসা করছি। দাদা বলরাম ভেবেছে আমি কৌশলে মণিটি হস্তগত করেছি। একথা তুমি সকলের সামনে সত্য করে বল।"

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মনে মনে ভাবলেঃ এখন আর আসল কথা গোপন করে লাভ কি? তার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছেঁ সত্য কথা বলাই ভাল।

স্যমন্তক মণিটি বের করে অক্রূর বললে—"প্রভু, শতধন্বার দেওয়া এই মণি এতদিন আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। এখন তুমি যখন সব কথাই জানতে পেরেছ তখন এ মণি আমি তোমারই হাতে অর্পণ করলাম। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

শ্রীকৃষ্ণ মণিটি হাতে নিয়ে বললেন—"এপর্যন্ত এই মণি নিয়েই যত বিপদের স্থষ্টি হয়েছে। এটা আমার নিয়েই বা কি হবে? লোকে ভাববে এইটির লোভেই আমি অনেক কিছু কাণ্ড করেছি। তার চেয়ে এ মণি তোমারই কাছে থাক অক্রূর। তুমি বরং ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যেন এ মণির সব দোষ কেটে গিয়ে এর মঙ্গলময় রূপই ফুটে ওঠে।"

অক্রূর মণিটি নিয়ে আবার নিজের গৃহে ফিরে গেল।

রেবতীর বিয়ে

রেবতী হল রৈবত রাজার পরমাসুন্দরী মেয়ে। শুধু রূপ নয় গুণও তার যথেষ্ট ছিল। রৈবত রাজা ভাবলেন, এমন মেয়ের বর পাই কোথায় ! অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন বর পাওয়া গেল না তখন রাজা মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। শেষে একদিন সকলের পরামর্শমতে, ব্রহ্মার সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন ব্রহ্মলোকে। সেখানে গিয়ে মেয়ের বিয়ের একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন, স্বয়ং ব্রহ্মার উপদেশও পাবেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিনি তাঁর কন্যাকে।

রাজা রৈবত ব্রহ্মলোকে গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন সেখানে গানের আসর বসেছে। সেই গান এত চমৎকার যে রৈবত রাজার মনে হল এমন গান পৃথিবীতে তিনি কোথাও শোনেননি। এই ভেবে তিনি একাগ্রমনে ব্রহ্মার আসরে বসে গান শুনতে লাগলেন। গান শেষ হবার পর তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন—“ভগবন, আমার মেয়ের বিয়ে কোথায় হবে আপনি বলে দিন।”

ব্রহ্মা হেসে বললেন—“তুমি কোন্ কোন্ রাজার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছিলে ?”

রৈবত রাজা বললেন—“হাঁ প্রভু, আমি এঁদের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব বলে ইচ্ছা করেছি, এখন আপনি বলুন এঁদের কোন্‌টি আমার মেয়ের উপযুক্ত বর।”

এই বলে রৈবত কয়েকজন বড় রাজার নাম করলেন।

ব্রহ্মা রাজার কথা শুনে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে তাঁকে বললেন—"তুমি যেসব রাজার নাম করেছ, তারা অনেকদিন আগেই ইহলোক পরিত্যাগ করেছে। এমন কি তাদের পুত্র-পৌত্রেরা পর্যন্ত এখন আর পৃথিবীতে নেই।"

রৈবত আশ্চর্য হয়ে বললেন—"সে কি প্রভু, আমি ত মাত্র কিছুক্ষণ আপনার ব্রহ্মলোকে এসেছি, এর মধ্যে এ ব্যাপার কি করে ঘটবে?"

ব্রহ্মা তখন রাজাকে বললেন—"আমার ব্রহ্মলোকের এক মুহূর্ত, মর্ত্যলোকের অনেক বৎসরের সমান। তাই যতটুকু সময় তোমার কন্যা ও তুমি ব্রহ্মলোকে আছ, সে সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে বহু যুগ কেটে গেছে। শুধু তুমি ও তোমার কন্যা রেবতী ব্রহ্মলোকে থাকার জন্য তোমাদের বয়স ঠিক আগের মতই আছে। এখন তোমরা মর্ত্যে ফিরে যাও।"

রৈবত রাজা তখন ব্রহ্মাকে বললেন—"প্রভু, আমার কন্যার দেখছি আর কোথাও বিয়ে হবার সম্ভাবনা নেই। এখন আমি কি করব আপনি আমাকে বলে দিন।"

তখন ব্রহ্মা বললেন—"তোমার কন্যা অতি সুলক্ষণা। তুমি দ্বারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের সঙ্গে তার বিয়ে দাও। এতে রেবতী খুব সুখী হবে আর এই হল আমার আদেশ অর্থাৎ বিধিলিপি।"

রাজা রৈবত তখন কন্যার সঙ্গে মর্ত্যে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর রাজধানী ও প্রাসাদ যেখানে ছিল সেখানে আর

নেই। তাঁর দূর জ্ঞাতি বংশের একজন রাজা সে দেশে রাজত্ব করছেন। রৈবত তাঁর কাছে গিয়ে সকল কথা বলতেই তাঁরা তাঁকে উন্মাদ ভেবে দূর করে দিলে।

এদিকে রাজা রৈবত তখন তাঁর কন্যা রেবতীকে নিয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে সব কথা বললেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনে সব বুঝতে পারলেন আর তাঁর দাদা বলরামকে ব্রহ্মার আদেশের কথা জানালেন।

বলরাম সমস্ত কথা শুনে ও রেবতীকে দেখে তাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। রৈবত রাজাও বলরামের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু ব্রহ্মলোকে কিছুক্ষণ থাকার জন্য রেবতীর শরীর খুব লম্বা হয়ে গিয়েছিল। বলরাম তার পাশে মাথায় অনেক ছোট বলে বোধ হচ্ছিল। তাই সকলে ঠাট্টা করাতে বলরাম খুব চটে গিয়ে তাঁর হাতের লাঙ্গলের এক ঘা মারলেন রেবতীর মাথায়।

লাঙ্গলের সেই প্রচণ্ড আঘাতে রেবতী আর লম্বা রইল না, বেঁটে হয়ে গেল। তখন বলরাম ও রেবতী পাশাপাশি দাঁড়াতে কেউ আর কোন কথা বলতে পারল না, কোন দোষও দিতে পারল না।

এই ভাবে মেয়ে-জামাইকে সুখী দেখে রৈবত রাজা সংসার ছেড়ে চলে গেলেন বনে তপস্যা করতে। যে ব্রহ্মলোক তিনি দেখে এসেছিলেন সেই ব্রহ্মলোকেই যেন মৃত্যুর পরে তাঁর স্থান হয় এই জন্য তিনি ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হলেন।

উপমন্যুর শিবপূজা

ব্যাঘ্রপাদ ঋষির ছেলে উপমন্যু।

বাপ খুব গরীব। অতিকষ্টে সংসার চলে। কোন দিন খেতে পায় তারা, কোন দিন উপবাসে দিন কাটে।

বনের মধ্যে আশ্রম তাদের। সংসারের মধ্যে বাপ, মা ও ছেলে উপমন্যু। বাপ ব্যাঘ্রপাদ ঋষি তপস্যা নিয়েই থাকেন, মা কোনক্রমে ফলমূল সংগ্রহ করে এনে আহারের যোগাড় করেন আর উপমন্যু বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খেলা করে বেড়ায়।

একদিন উপমন্যু বললে—"মা, আমি অনেক দিন মামার বাড়ী যাই নি, একবার মামার বাড়ী যাব।"

মা বললেন—"বেশ ত বাবা, দিনকতক মামার বাড়ী থেকে এস। তোমার মামারা ত আমাদের মত গরীব নয়, সেখানে তোমার খাওয়া-পরার কোন কষ্ট থাকবে না।"

উপমন্যু মামার বাড়ী গেল।

মামার বাড়ীতে পেট ভরে নানা সুখাদ্য—দুধ ঘি মণ্ডা খেয়ে উপমন্যু ভাবলে—মামার বাড়ীতে এত সুখ, আর আমাদের আশ্রমে এত কষ্ট কেন ?

মামাতো ভাইবোনেরা উপমন্যুকে জিজ্ঞেস করে—"হ্যাঁ রে উপমন্যু, বনে কি খেতিস্ ?"

উপমন্যু বলে—"কত রকম গাছের ফলমূল। কত রকমের আস্বাদ।"

মামাতো ভাইবোনেরা হো-হো করে হেসে ওঠে, বলে—"তুই বলে তাই খাস্, আমরা হলে ওসব ছুঁতামও না।"

এ কথায় উপমন্যুর খুব অভিমান হয়। সে রাগ করে মামার বাড়ী থেকে চলে আসে। আশ্রমে ফিরে মাকে বলে—"মা, আমি মামার বাড়ীতে কত দুধ খেয়েছি, এখানেও আমি দুধ খাব,—আমাকে দুধ এনে দাও।"

মা আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন—"বেশ ত, আমি দুধ এনে দিচ্ছি।"

কিন্তু গরীব মা দুধ পাবেন কোথায়? তাই কিছু চাল ভিজিয়ে তাই শিলে বেটে জলে গুলে দুধের মত সাদা করে উপমন্যুর কাছে এনে দিলেন।

উপমন্যু ত আনন্দে অস্থির। মা দুধ এনে তাকে দিচ্ছেন এ সৌভাগ্য তার কোনদিন হয় নি। তাই তাড়াতাড়ি সে চালবাটা জল খেতে গেল।

কিন্তু একটুখানি মুখে দিয়েই উপমন্যু রাগে চেঁচিয়ে উঠল—"মা, এ আমাকে কী দিয়েছ? এ ত দুধ নয়!"

মা আর কি করেন, ছেলের কাছে ধরা পড়ে আঁচলে চোখের জল মুছে বললেন—"হ্যাঁ বাবা, সত্যি কথা, ওটা দুধ নয়। আমরা খুব গরীব, দুধ কোথা পাব?"

উপমন্যু তখন বললে—"হ্যাঁ মা, আমরা এত গরীব কেন? তুমি বলে দাও কি করলে আমি পেট ভরে দুধ খেতে পাব।"

মা তখন বললেন—"আমাদের অদৃষ্টের দোষে আমরা গরীব। জগতের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব। তাঁর পূজা করলে তিনি

নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। তখন আর আমাদের কোন দুঃখকষ্ট থাকবে না।”

উপমন্যু বললে—“তা’হলে মা, আমি শিবপূজা করব।”

মা বললেন—“বাছা, একমনে শিবের আরাধনা করতে হয়। সমস্ত চিন্তা ছেড়ে সর্বদা শিবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে হয়, তবেই শিব কৃপা করেন। আমরা সংসারী, সংসার ছেড়ে ত যেতে পারি না। তাই শিবের আরাধনা প্রাণভরে করতে পারি না।”

উপমন্যু তখন মাকে বললে—“মা, আমি এই বন ছেড়ে আর এক বনে গিয়ে শিবের তপস্যা করব। দেখি, যদি শিবের কৃপা পাই।”

মা কত বোঝালেন, কিন্তু উপমন্যু শুনল না। সে অন্য বনে চলে গেল শিবের আরাধনার জন্য।

উপমন্যু যে বনে গেল, সেখানে এমন একদল হিংসুক ঋষি ছিলেন যাঁরা পরের তপস্যা দেখলে ভাবতেন যে তার তপস্যার বিঘ্ন না ঘটালে তাঁদের তপস্যার ফল হাতছাড়া হবে। তাই তাঁরা উপমন্যুকে তপস্যা করতে দেখে খুব রেগে গেলেন। উপমন্যুর কাছে গিয়ে তাঁরা বললেন—“এত অল্প বয়সে তুমি এসেছ তপস্যা করতে? তোমার ত এ বয়সে খেলাধূলা করে বেড়াবার সময়। যাও বাড়ী ফিরে যাও, তপস্যা ছাড়ো।”

কিন্তু উপমন্যু তাঁদের কথায় কান না দিয়ে আরও ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করলে।

তখন যাতে তার তপস্যা ভঙ্গ হয় ঋষিরা তার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন সকল ঋষি দল বেঁধে এসে উপমন্যুকে

তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। কিন্তু উপমন্যু তাঁদের কথা না শুনে তপস্যা করে যেতে লাগল।

ঋষিরা তখন পরামর্শ করতে লাগলেন কি করে উপমন্যুর তপস্যা ভঙ্গ করা যায়। উপমন্যু এদিকে মাটির শিব গড়ে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে প্রাণভরে শিবপূজা করে যাচ্ছে এমন সময় ঋষিরা এসে তাকে মেরে তাড়াতে গেলেন। উপমন্যু তখন 'নমঃ শিবায়' বলে শিবের মাথায় ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে শিবকে তার অবস্থার কথা মনে মনে জানালে।

এদিকে কৈলাসে শিবের কাছে উপমন্যুর কাতর আবেদন পৌঁছল। শিব আর স্থির থাকতে পারলেন না, ছুটে এলেন উপমন্যুকে রক্ষা করতে। কিন্তু দর্শন দিলেন না। ঋষিদের উপর শিবের অনুচরেরা দারুণ অত্যাচার ও মারধোর আরম্ভ করল। সে মারধোর খেয়ে ঋষিরা সেখান থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেলেন।

দেবতারাও দেখলেন মহাবিপদ। উপমন্যু যদি এমন ভাবে তপস্যা করে যায়, তবে শিবের বর লাভ করে সে হয়ত স্বর্গের সিংহাসনেও বসতে পারে। তখন দেবতারা সকলে মিলে শিবের কাছে গিয়ে বললেন—"হে দেবাদিদেব, আপনি উপমন্যুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন সে কি চায়? নইলে আমরা আর সর্বদা উৎকণ্ঠায় কাল কাটাতে পারি না।"

শিব কি আর করবেন? দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য তিনি ইন্দ্রের রূপ ধরে হাতীতে চড়ে উপমন্যুর কাছে উপস্থিত হলেন।

উপমন্যুকে ডেকে শিব বললেন—"হে উপমন্যু, তুমি কার পূজা করছ ?"

উপমন্যু বললে—"আমি শিবের পূজা করছি।"

তখন ইন্দ্র-বেশী শিব বললেন—"আমি ইন্দ্র, দেবতাদের রাজা, সেই সর্বহারা শিবের উপাসনা করে কি হবে ? তার চেয়ে তুমি আমার উপাসনা কর।"

এ কথায় উপমন্যু খুব রেগে গিয়ে শিবপূজার মন্ত্রপূত যজ্ঞভস্ম ছুঁড়ে মারল ইন্দ্রকে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! হাতীর পিঠের উপর বসে ইন্দ্র হাসতে লাগলেন।

তখন উপমন্যু ভাবলে—আমি শিবের নাম করে যজ্ঞভস্ম ছুঁড়ে মারলাম, কিন্তু ইন্দ্রের ত তাতে কোন ক্ষতিই হল না ! আমার এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই, আমার আগুনে পুড়ে মরাই ভাল।

এই ভেবে উপমন্যু কাঠের আগুন জ্বেলে তাতে পুড়ে মরতে গেল।

তখন তার মনের এ অবস্থা দেখে শিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। ইন্দ্রের রূপ ত্যাগ করে নিজের মূর্তি ধরে ছুটে এসে উপমন্যুকে আগুন থেকে তুলে নিলেন।

শিবের মূর্তি সামনে দেখে উপমন্যু প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে।

এই সময়ে দেবী পার্বতীও এসে শিবের পাশে দাঁড়ালেন। উপমন্যু শিব ও পার্বতীকে চোখের সামনে দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করল।

ইন্দ্রবেশী শিব বললেন—"...আমার উপাসনা কর।"

পার্বতী বললেন—"বাছা উপমন্যু, তুমি আমাদের কাছে কি চাও?"

উপমন্যু বললে—"আমি যে আপনাদের দর্শন পেয়েছি, এই যথেষ্ট, আর কিছুই চাই না।"

পার্বতী উপমন্যুকে তাঁর কোলে টেনে নিয়ে তার মুখে ক্ষীরের পাত্র ধরলেন। উপমন্যু প্রাণ ভরে সেই ক্ষীর খেয়ে ধন্য হল।

নারদের শিবপূজা

পৃথিবী ভ্রমণ করে নারদ ফিরছিলেন স্বর্গে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল দাক্ষিণাত্যের গোকর্ণ দেশের বিখ্যাত শিবমন্দির ত তাঁর দেখা হয় নি, সেখানে গিয়ে শিবপূজাও করা হয় নি।

নারদ তখন আবার ফিরলেন। গোকর্ণ দেশে উপস্থিত হয়ে তিনি মন্দিরের পাশ দিয়ে চলেছেন এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল এক ব্রাহ্মণের। ব্রাহ্মণও ফুলের সাজি হাতে নিয়ে দেবোদ্যানে যাচ্ছিল ফুল তুলতে। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্রাহ্মণ, তুমি কী ফুল তুলতে যাচ্ছ ?"

ব্রাহ্মণ বললে—"আমি ত ফুল তুলতে যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি ভিক্ষা করতে। ভিক্ষা না করলে আমি খাব কি ?"

নারদ বললেন—"ফুলের সাজি নিয়ে কি কেউ ভিক্ষা করতে যায়। নিশ্চয় তুমি ফুল তুলতে যাচ্ছ।"

ব্রাহ্মণ বললে—"আমার কথা কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

নারদ বললেন—"বেশ, তুমি যদি ফুল তুলতে যাও, তবে কী ফুল তুলতে যাচ্ছ সেটা আমাকে বল। আমিও তা'হলে সেই ফুলে শিবের অর্চনা করব।"

ব্রাহ্মণ বললে—"বলছি আমি ভিক্ষা করতে যাচ্ছি তবুও কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? কি রকম লোক তুমি ?"

নারদ আর কিছু বললেন না, শুধু মনে মনে হাসলেন।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণ নারদের কাছ থেকে বনের মধ্যে গিয়ে

এক চাঁপাগাছের নীচে দাঁড়াল, তারপর শিবের পূজার জন্য চাঁপাগাছের কাছ থেকে ফুল চাইতেই চাঁপাগাছ তাকে অনেক ফুল দিলে। সাজি ভরে চাঁপাফুল নিয়ে ব্রাহ্মণ ফিরে গিয়ে মন্দিরে ঢুকল, তারপর সেই ফুলে শিবের পূজা করল।

নারদ সমস্তই লক্ষ্য করছিলেন। তিনি তখন চাঁপাগাছের কাছে গিয়ে বললেন—"হে চাঁপাগাছ, তুমি ব্রাহ্মণকে ফুল দিয়েছ ?"

চাঁপাগাছ বললে—"কৈ আমি ত ফুল দিই নি।"

নারদ ত অবাক্। চাঁপাগাছ এত বড় মিথ্যা কথাটা বললে! বলে কিনা ফুল দিইনি! নারদ তখন আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। শিবের মূর্তির কাছে গিয়ে দেখেন রাশি রাশি চাঁপাফুল শিবের পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে।

তিনি তখন সেই ব্রাহ্মণকে গিয়ে বললেন—"তুমি এত মিথ্যা কথা বল, অথচ শিবপূজাও কর। তোমার এতে কত পাপ হয়, তা কি তুমি জান না ?"

ব্রাহ্মণ বললে—"আমি রোজ চাঁপাফুল দিয়ে শিবের পূজা করি। তাই তিনি আমার সকল পাপ হরণ করেন। চাঁপা-ফুলের চেয়ে শিবের প্রিয় আর কিছু নেই।"

নারদ আশ্চর্য হলেন। ধুতুরাফুলই ত শিবের খুব প্রিয় ফুল, এটাই তাঁর জানা আছে। কিন্তু এদেশে এসে এ কী কথা শুনলেন তিনি! তখন সেই শিবের পায়ে দেওয়া চাঁপা-ফুল দিয়েই তিনি শিবের পূজা করলেন।

তারপর আবার চাঁপাগাছের কাছে গিয়ে বললেন—"হে

চাঁপাগাছ, তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বললে কেন? জান, এতে তোমার কত পাপ হয়েছে?"

চাঁপাগাছ বললে—"পাপ হবে কেন? আমার ফুলে শিবপূজা হয়, তাই শিব আমার সকল পাপ মার্জনা করেন।"

নারদ খুব চটে উঠলেন—"কী, সামান্য ফুলগাছের এতদূর স্পর্ধা! আমি নারদ, দেবর্ষি, আমার কাছে মিথ্যা কথা!"

এবার নারদ সেই ব্রাহ্মণের সন্ধানে বের হলেন। পথে যেতে যেতে এক ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা। সে কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

নারদ তখন ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?"

ব্রাহ্মণী বললে—"আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে আমি কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম। এক ব্রাহ্মণ এসে সেই টাকার অর্ধেক ভাগ চায়। আমি কেমন করে তা দেব? তাই সে ব্রাহ্মণ জোর করে আমার টাকা নিয়ে গেছে।"

নারদ বললেন—"বেশ ত, তুমি রাজার কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণের এ অত্যাচারের কথা বল না কেন?"

ব্রাহ্মণী বললে—"রাজার কাছে গিয়ে কি হবে? সেই ব্রাহ্মণ রোজ চাঁপাফুল দিয়ে শিবপূজা করে। তাই সে শিবের অনুগ্রহ লাভ করেছে। রাজাও সেই জন্য তাকে ভয় করে। তাই রাজার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।"

নারদ তখন বললেন—"বেশ, আমি তোমাকে অর্থ দিচ্ছি, তুমি সেই অর্থ দিয়ে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।"

কিন্তু ব্রাহ্মণী তবুও কাঁদতে লাগল। নারদ তখন তার কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণী বললে—"আমার একটি গাভী আছে, ব্রাহ্মণ সেটিরও অর্ধেক ভাগ চায়। কিন্তু এ-ত টাকাপয়সা নয় যে অর্ধেক ভাগ দেব। ব্রাহ্মণ চায় গাভীটির অর্ধেক কেটে নিয়ে যেতে। আমি কোন্ প্রাণে এ অধর্ম ও মহাপাপ সহ্য করব?"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে নারদ ত অবাক!—এ কী কাণ্ড হচ্ছে এখানে? কোন পাপকে পাপ বলে গণ্য করে না কেন? সব পাপ থেকে এমন মুক্তির উপায় কী আছে এখানে?

তখন ব্রাহ্মণী বললে—"ব্রাহ্মণ রোজ চাঁপাফুলে শিবপূজা করে, তাই শিব তার সব পাপ দূর করে দেন।"

নারদ ভাবলেন—এ ত বড় আশ্চর্য ব্যাপার! লোকে পাপ করবে আর চাঁপাফুলে শিবপূজা করবে, তা'হলেই তার পাপমুক্তি ঘটবে! এতো বড় অন্যায় কি কখনো ঘটতে দেওয়া উচিত?

তাই তিনি তখনি মহাদেবের কাছে গিয়ে বললেন—"হে দেবাদিদেব, আপনার রাজ্যে এ কী কাণ্ড! অন্যায় অধর্ম কি এখানে মাথা উঁচু করে থাকবে আর ন্যায় ও ধর্ম কি এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে? আপনি এর একটা বিহিত করুন।"

মহাদেব বললেন—"চাঁপাফুল আমার বড় প্রিয়। তাই যে চাঁপাফুলে আমার পূজা করে আমি তার সব পাপ মার্জনা করি। আর আমি তোমাকে ভার দিচ্ছি নারদ, তুমি যদি পার এ অধর্ম অন্যায় দূর কর।"

নারদ তখন বললেন—"এ কি কথা প্রভু? আপনি দেবাদিদেব, আপনি দিচ্ছেন আমার উপর ভার? এর চেয়ে আমার প্রতি অবিচার আর কি হতে পারে?"

শিব তখন হেসে বললেন—"নারদ, তোমার প্রতি কেন ভার দিলাম, তুমি সেটা বুঝে দেখ। এখন তোমার যা করবার তা কর।"

নারদ শিবের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তখনি সেই চাঁপাগাছের কাছে গিয়ে বললেন—"তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছ চাঁপাগাছ, আজ থেকে আমি বলছি তোমার ফুলে আর শিবপূজা হবে না। তোমার প্রতি এই আমার অভিশাপ রইল।"

সেই থেকে চাঁপাফুলে আর শিবপূজা হয় না! দেশ থেকে অন্যায়-অধর্মও লোপ পেয়ে গেল।

ঋষি ভার্গবের যমালয় দর্শন

রাজা শতানিক খুব দানশীল ও ধার্মিক রাজা ছিলেন।

তিনি অনেকদিন ভালভাবে রাজত্ব করে শেষে পরলোক গমন করেন।

তাঁর ছেলে সহস্রানিক রাজা হলেন বটে, কিন্তু শতানিকের মত অত দানও করলেন না, ধার্মিকও হলেন না। প্রজারা সহস্রানিকের ব্যবহারে খুবই মর্মপীড়া ভোগ করতে লাগল।

তখন ব্রাহ্মণেরা এসে সহস্রানিককে বললেন—"মহারাজ, আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতার পথ অনুসরণ করে ধর্মকার্য করেন না কেন? দান-ধর্মও বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে আমরা খুবই কষ্ট অনুভব করছি।"

সহস্রানিক হেসে বললেন—"দান ও পুণ্যকাজ করে কি হবে—সকলের যেকালে একই গতি? মৃত্যুর পরে সকলেই পরলোকে যায়।"

ব্রাহ্মণেরা তখন বললেন—"মহারাজ, পুণ্যকাজ করলে লোকে স্বর্গে যায় আর পাপকাজ করলে নরকে যায়।"

রাজা সহস্রানিক বললেন—"বেশ, তা'হলে আপনারা বলুন, আমার পিতা স্বর্গে কোন্ স্থানে, কি অবস্থায়, কি সুখে আছেন?"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"তিনি স্বর্গে আছেন এই পর্যন্তই আমরা বলতে পারি। কিন্তু স্বর্গের কোন্ স্থানে আছেন বা কি

করছেন তা আমরা কি করে বলব? মানুষের জ্ঞান এখানে সীমাবদ্ধ; মানুষ পরলোকের সব কথা জানতে পারে না, জানবার উপায়ও নেই।”

রাজা সহস্রানিক তখন হেসে বললেন—“ওসব যখন জানবার উপায় নেই তখন আর ধর্মকার্য করে কি হবে?”

রাজার কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা দুঃখিতমনে চলে গেলেন। তখন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—“শুনেছি ভার্গব ঋষি মহাতপস্বী। তিনি তপোবলে পরলোকের কথা সমস্ত জানতে পারেন। চল, আমরা সকলে ভার্গব ঋষির কাছে যাই।”

ভার্গব ঋষি গভীর বনে তপস্যা করছিলেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে তিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ভগবানের ধ্যান করছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই বনের মধ্যে গিয়ে ভার্গবের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভার্গবের ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি ব্রাহ্মণদের দেখে খুব আশ্চর্য হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—“তোমরা সকলে কি জন্য আমার কাছে এসেছ?”

ব্রাহ্মণেরা বললেন—“আপনি মহাজ্ঞানী, পরম যোগী; আপনি যোগবলে বলতে পারেন রাজা সহস্রানিকের পিতা শতানিক পরলোকে গিয়ে কোথায় কি অবস্থায় আছেন? আপনার কাছ থেকে এই সংবাদ জেনে আমরা গিয়ে রাজাকে বলি, তাই শুনে রাজা ধর্মকার্য ও দান-ধ্যান করবেন। ধর্মকার্য না হলে দেশের চারদিকে হাহাকার উঠবে, শস্যক্ষেত্র শুকিয়ে

যাবে, অনাবৃষ্টি ও মড়কে দেশ ছেয়ে যাবে। তাই রাজার কথা শুনে আমরা আপনার কাছে এসেছি। আপনি এর একটি বিহিত করুন।"

ব্রাহ্মণদের কথা শুনে ভার্গব বললেন—"বেশ, আমি পরলোকে গিয়ে নিজের চোখে রাজা শতানিকের অবস্থা দেখে এসে তোমাদের বলব।"

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"বেশ, আমরা এইখানেই অপেক্ষা করে রইলাম। আপনি শীঘ্র দেখে এসে আমাদের বলুন।"

তখন ভার্গব ঋষি যোগবলে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন।

পরলোকের পথে স্বর্গে যেতে হলে যে ভাবে যাওয়া যায় ভার্গব ঋষি ঠিক সেই ভাবে যেতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর তিনি দেখতে পেলেন পথের পাশে বিশাল স্থান জুড়ে নরককুণ্ড রয়েছে। সেই নরককুণ্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছে। একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি নরককুণ্ডের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন এক ব্রাহ্মণ নরককুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলছে—"হে ভার্গব ঋষি, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি এক সময়ে তোমার সঙ্গে অনেক যাগযজ্ঞ করেছি। কিন্তু, তুমি আমাকে আমার প্রাপ্য দক্ষিণা দাও নি। এখন আমাকে আমার দক্ষিণা দাও।"

ভার্গব ঋষি বললেন—"তা কেমন করে হবে? এটা পরলোক। ইহলোকের কোন দেনাপাওনা মেটানো এখানে চলবে না।"

সেই ব্রাহ্মণ তখন ভার্গব ঋষিকে নানা কটুবাক্য বলতে লাগল। ভার্গব বিরক্ত হয়ে সেই নরককুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"এখন আর ঐ সব কথা আমাকে বলছ কেন? তুমি কি চাও?"

ব্রাহ্মণ বললে—"আমি চাই তোমার পুণ্যের অর্ধেক আমাকে দাও, তা' না হলে আমি সকলের কাছে এই নরককুণ্ডে প্রচার করে দেব তুমি কত বড় অধার্মিক।"

ভার্গব ঋষি তখন বললেন—"বেশ, তোমাকে আমি আমার পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দিচ্ছি। যদি এতে তোমার প্রাপ্য শোধ হয় তবে তা' এখনি নাও।"

ব্রাহ্মণ রাজী হওয়াতে ভার্গব তাকে তাঁর পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দান করে আবার এগিয়ে চললেন।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন এমন সময় সেই নরককুণ্ডের মধ্য থেকে আর একজন কে চিৎকার করে বললে—"পেন্নাম হই ভার্গব ঠাকুর, আমার পাওনাটা দিয়ে যান।"

ভার্গব আশ্চর্য হয়ে বললেন—"তুমি আবার কে হে বাপু, আমার কাছে পাওনা চাইছ?"

তখন নরককুণ্ডের ভিতর থেকে সেই লোকটি বললে—"আমি পৃথিবীতে আপনার গরুর রাখাল ছিলাম। আমি অনেকদিন আপনার গরু চরিয়েছি। কিন্তু আমার কিছু বাকি মাহিনা আপনি আমাকে আর দেন নি। এখন এইখানে যখন আপনার দর্শন পেয়েছি, তখন আর ছাড়ি কেন? আমার পাওনা আমি আদায় না করে ছাড়ব না।"

ভার্গবের সব কথা মনে পড়ল। তিনি তখন তাকেও তাঁর পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দিয়ে আবার এগিয়ে চললেন।

কিন্তু অল্পদূর যেতেই আবার কে যেন সেই নরককুণ্ডের ভিতর থেকে ভার্গবকে ডাকলে। ভার্গব তখন থেমে দেখেন যে, তাঁর পরিচিত একজন রজক তাঁর কাছে কাপড় কাচার বাকি পয়সা দাবি করছে। ভার্গবের মনে পড়ল সত্যই ত, এ লোকটার তাঁর কাছে পয়সা পাওনা আছে। তখন তিনি তাকেও তাঁর পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দিয়ে আবার পথে এগিয়ে চললেন।

দু'পা না যেতেই আবার তাঁর পিছনে ডাক শুনতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখেন সেই নরককুণ্ডের মধ্য থেকে এক তাঁতী তাঁকে ডেকে বলছে—"কি ঠাকুর, এখন বুঝি চিনতে পারছ না? একদিন পৃথিবীতে আমার কাছ থেকে ধারে কাপড় কিনে আর দাম দাও নি। এখন যেকালে তোমাকে এখানে পেয়েছি, আমিও আমার দাম আদায় না করে ছাড়ছি না।"

অগত্যা ভার্গব তাকেও তাঁর পুণ্যের ষষ্ঠাংশ দিয়ে শান্ত করে আবার পথ চলতে লাগলেন।

ভার্গব ঋষি হঠাৎ আবার শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকছে। চম্‌কে উঠে পিছনের দিকে চেয়ে দেখেন এক তীর্থযাত্রী সেই নরককুণ্ডের মধ্য থেকে তাঁকে ডাকছে।

"কি ব্যাপার? কে তুমি?"—বিরক্ত হয়েই ভার্গব ঋষি প্রশ্ন করলেন তাকে।

"এখন আর চিনতে পারবে কেন ঠাকুর? একদিন তীর্থ-

যাত্রার সময়ে আমার কাছ থেকে ধার করে পাথেয় নিয়েছিলে। বাড়ী ফিরে পাঠিয়ে দেব বলে তা' আর দাও নি। এখন যেকালে এখানে এসেছ তবে দিয়ে যাও।"—বললে তীর্থযাত্রী।

ভার্গব ঋষি চিনতে পারলেন তাকে। কি আর করেন, তাকেও দিলেন তাঁর পুণ্যের ষষ্ঠাংশ।

আবার চলতে লাগলেন তিনি। এবারেও সেই নরককুণ্ড থেকে কে যেন তাঁকে ডাকলে। তিনি অবাক্ হয়ে দেখলেন সেখানেও তাঁর এক পাওনাদার! কি আর করেন, অত্যন্ত বিরক্তমনে তিনি তাকেও শেষ ষষ্ঠাংশ দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু আর পারলেন না। তাঁর সমস্ত পুণ্য ফুরিয়ে গেছে, স্বর্গের পথে যাবেন কি করে? তাই নিশ্চল হয়ে সেই নরককুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে নরককুণ্ডের পাপীদের অসহ্য যন্ত্রণা দেখতে লাগলেন।

চারদিকে দারুণ অন্ধকার। এই সময়ে তাঁর মনে হল একমাত্র সূর্যদেবই এই অন্ধকার দূর করতে পারেন। তিনি সূর্যদেবের স্তব করতে লাগলেন। তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব সেখানে এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

কিন্তু দু' পা যেতেই আবার কে যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকল। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন মহারাজ শতানিক তাঁকে আহ্বান করছেন।

শতানিককে দেখে ভার্গব বললেন—"মহারাজ, আমি আপনার সন্ধানে স্বর্গে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আপনি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। এ কাণ্ড কি করে হ'ল? এ যে

দেখছি অসম্ভব ব্যাপার! আপনি চিরকাল ধর্মকার্য করে এসেছেন, অনেক দান-ধ্যান করেছেন। এখন আপনার মত ধার্মিক রাজার এ কী পরিণতি!"

শতানিক বললেন—"হে ভার্গব ঋষি, লোকে আমার সম্বন্ধে যতটা ভাবে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি যা কিছু দান করেছি সে সমস্তই প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ ও ধনরত্ন। আমার নিজস্ব বলতে কিছুই ছিল না। আর যাগযজ্ঞ যা কিছু করেছি, সে শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমার নাম কেনবার প্রবৃত্তিতে। সুতরাং সবই স্বার্থের প্ররোচনায় করেছি। নিষ্কামভাবে কিছুই করি নি। তাই আজ আমাকে এই নরককুণ্ডে পচে মরতে হচ্ছে।"

ভার্গব বললেন—"মহারাজ, আপনি বলুন, কি করলে আপনি এই নরককুণ্ড থেকে পরিত্রাণ পান।"

শতানিক বললেন—"যদি আমার পুত্র সহস্রানিক নিষ্কাম ধর্ম পালন করে অহঙ্কারশূন্য হয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে, তবেই পুত্রের সেই পুণ্যবলে আমি এ নরক থেকে মুক্তিলাভ করব।"

এই কথা শেষ হতে না হতেই নরককুণ্ডের যমদূতেরা রাজা শতানিককে আবার টেনে নিয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাতে গেল।

ভার্গব অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সূর্যদেবকে প্রশ্ন করলেন—"প্রভো, কি কি ধর্মকাজ করলে শতানিক মুক্তি পাবেন?"

সূর্যদেব বললেন—"মহাদেবের পূজা-অর্চনা আর নিষ্কামভাবে

দৈহিক পরিশ্রমে পুণ্য অর্জন, এ দুটির দ্বারাই সহস্রানিক যে পুণ্য লাভ করবেন তাতেই শতানিকের হবে মুক্তি।”

ভার্গব তখন আর না এগিয়ে সোজা ফিরে এলেন মর্ত্যে। ব্রাহ্মণেরা বনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে এবং তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনে তাঁরা তখনি চলে গেলেন রাজা সহস্রানিকের কাছে।

সব কথা শুনে রাজা সহস্রানিক সিংহাসন ছেড়ে সাধারণ বেশে বার হলেন নিজের পরিশ্রমদ্বারা অর্থ উপার্জন করতে। তারপর সেই অর্থ দান করলেন দরিদ্রগণের মধ্যে। এইভাবে পুণ্যসঞ্চয় করে সেই পুণ্য শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করলেন তাঁর, পিতা শতানিকের উদ্দেশ্যে। আর মহাদেবের পূজা করতে লাগলেন ভক্তিভরে। এবার আর শতানিকের নরক থেকে মুক্তি পেতে বিলম্ব হল না। তিনি তখন স্বর্গে চলে গেলেন।

মাঝ থেকে ভার্গব ঋষির কিন্তু কর্ম ফলে নরকদর্শন হয়ে গেল।

সুবাদী ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মঘাতিনী গাভী

সুবাদী নামে এক ব্রাহ্মণের বৃদ্ধা মাতা মৃত্যুশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

সুবাদী জিজ্ঞাসা করলে—"মা, তুমি মৃত্যুকালে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন?"

মা বললেন—"কি আর বলব বাবা, আমার চিরদিনের ইচ্ছা ছিল যে কাশীধামে যেন আমার মৃত্যু হয়। সেখানে গঙ্গায় যেন আমার অস্থি বিসর্জন করা হয়, কিন্তু আমার কাশীধামে যাওয়া হল না। যাই হোক্ তুমি আমার মৃত্যুর পর আমার অস্থি কাশীর গঙ্গায় বিসর্জন দেবে—এই কথা আমার মৃত্যুশয্যায় স্বীকার কর, তা'হলে আমি সুখে মরতে পারব।"

সুবাদী তখন স্বীকার করল যে তার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর অস্থি কাশীর গঙ্গায় বিসর্জন দেবে।

মায়ের মৃত্যু হল। যথাসময়ে সুবাদী মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করে তাঁর অস্থি চাদরে বেঁধে নিয়ে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করল।

কাশীর গঙ্গা ত কাছে নয়, অনেক দূর। অনেক দেশ পার হয়ে তবে কাশীধামে যেতে হয়। তাই সুবাদী জিজ্ঞাসা করে করে পথ চলতে লাগল।

অনেক দূর যাবার পর খুব শ্রান্ত হয়ে সুবাদী এক ব্রাহ্মণের বাড়ী অতিথি হল। কিন্তু ব্রাহ্মণের শোবার ঘর একখানির

বেশি না থাকাতে ব্রাহ্মণকে শুতে দেওয়া হল গোয়ালের এক পাশে।

এদিকে দুধ দোহানোর জন্য ব্রাহ্মণ গাভীর কাছে এল। কিন্তু বাছুর গাভীর কাছে যাবার জন্য খুব ছটফট করতে লাগল। তাতে বাছুরের পা ব্রাহ্মণের পায়ে আঘাত করল। ব্রাহ্মণ কিন্তু বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে না দিয়ে তাকে খুব মারতে লাগল ও বেঁধে রেখে দিল।

দুধ দোহা শেষ হলেও ব্রাহ্মণ বাছুরকে গাভীর কাছে যেতে দিল না। তাকে সেই অবস্থায় বেঁধে রেখে দিল। বাছুরের কষ্ট দেখে গাভীটিরও খুব কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু উপায়ই বা কি!

গভীর রাত্রিতে স্থবাদী শুনতে পেলে গোয়ালে যেন কারা কথা কইছে। আশ্চর্য হয়ে দেখলে গাভী ও বাছুরের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

গাভী বলছে বাছুরকে—"কি করব বাছা, পাজী বামুনটা তোকে মারলে আর একফোঁটা দুধও খেতে দিলে না।"

বাছুরটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—"মা, আমার সারাদিন পেটে এক ফোঁটা দুধ পড়ে নি। আমার যে কী খিদে পেয়েছে তা' আর কী বলব! বামুনের হাতে মার খেয়ে আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে গেছে। খিদের জ্বালায় আর থাকতে পারছি না।"

গাভী বললে—"আমি এর প্রতিশোধ নেব। কাল সকালে যখন আমার দুধ দোহনের জন্য বামুনের ছেলেটা

আসবে তখন আমি তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলব। আমার বাছাকে কষ্ট দেওয়ার শোধ তুলব।”

বাছুর বললে—“না মা, সে কাজ কোরো না। এতে ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে। ব্রহ্মহত্যার পাপ বড় ভয়ানক। সে পাপ থেকে উদ্ধারলাভ করা বড় শক্ত।”

গাভী বললে—“তার উপায়ও আছে। আমি এমন এক তীর্থস্থান জানি যেখানে স্নান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। কাল সকালে আমি ব্রাহ্মণের ছেলেকে হত্যা করে ছুটে রাস্তায় চলে যাব। তারপরে সেই তীর্থস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করব। পাপমোচনের পর আবার ফিরে আসব।”

বাছুর বললে—“কিসে বুঝব যে তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তিলাভ করলে?”

গাভী বললে—“ব্রহ্মহত্যার পরেই আমার সারা গা কালো হয়ে যাবে। তারপর যখন আমি তীর্থে স্নান করে পবিত্র হব, তখন আমার গা আবার এখনকার মত সাদা হয়ে যাবে। এই হবে আমার পাপমুক্তির পরিচয়।”

সুবাদী গোয়ালঘরে থেকে গাভী ও বাছুরের মধ্যে উক্তরূপ কথাবার্তা শুনে ভাবলে, ভালই হল। এখন এই গাভী যে পথে যাবে আমিও সেই পথে যাব। তা'হলে সেই তীর্থস্থানের সন্ধান পাব।—এই ভেবে সুবাদী সকাল হবার প্রতীক্ষায় রইল।

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের ছেলে এল গাভীর কাছে দুধ দোহানোর জন্য। গাভীও প্রস্তুত ছিল। সে তখনি প্রচণ্ড

গাভীটি···লাফিয়ে পড়ল নর্মদার জলে (পৃঃ ৮৬)

বেগে তার শিং দিয়ে আঘাত করল ব্রাহ্মণের ছেলের পেটে। সেই আঘাতে উদর বিদীর্ণ হয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে মারা পড়ল।

গাভী তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার সর্বাঙ্গ তখন কালো হয়ে গেছে। সুবাদীও সেই গাভীর পিছনে পিছনে চলল। যেদিকে গাভী যায় সুবাদীও সেইদিকে যায়। এই ভাবে অনেক দেশ পার হয়ে গাভী এসে পৌঁছল নর্মদা নদীর তীরে নন্দিকেশ তীর্থে। সেখানে একটি চমৎকার মন্দিরে শিবমূর্তি আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গাদেবী নর্মদা নদীর জলধারা দিয়ে বয়ে এসে শিবের চরণে প্রণাম জানিয়ে যান। তাই ঐ দিন নর্মদা নদীতে স্নান গঙ্গাস্নানের তুল্য হয়।

গাভীটি এসে নর্মদাতীরে অপেক্ষা করতে লাগল ঐ দিনটির জন্য। তারপর সেই পুণ্যদিনে লাফিয়ে পড়ল নর্মদার জলে। দেখতে দেখতে গাভীর দেহের কালো রং বদলে গিয়ে আবার সাদা রং হয়ে গেল। সে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেল।

সুবাদী সমস্ত দেখলে, তারপর নিজেও সেই নর্মদা-জলে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে স্নান করল।

কিন্তু তার মায়ের অস্থি তখনও তার চাদরে বাঁধা। তার মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার তার একান্ত ইচ্ছা। সুবাদী আবার কাশীধামের উদ্দেশে পথ চলতে লাগল।

কিছুদূর যেতেই মা গঙ্গার দৈববাণী হল—"বাছা, আমি তোমার মনের কথা জানি। তোমার আর কাশীতে যাবার

দরকার নেই। তুমি আজ নন্দিকেশ তীর্থে নর্মদার জলে তোমার মায়ের অস্থি বিসর্জন কর। তা'হলেই তোমার মায়ের মুক্তিলাভ ঘটবে। তোমার মা বৈকুণ্ঠে যাবে।"

সুবাদী তখনই ফিরে এসে তার মায়ের অস্থি নর্মদার জলে বিসর্জন দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সে যেন দেখতে পেলে তার মা জল থেকে উঠে অপরূপ-জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে আকাশপথে স্বর্গে চলে গেলেন।

সুবাদী তখন সন্তুষ্টমনে দেশে ফিরে এসে সকলকে এই আশ্চর্য কাহিনী বললে। সেই থেকে নন্দিকেশ তীর্থ শিবের মহিমার সঙ্গে গঙ্গার মাহাত্ম্যও জগতে প্রচার করছে।

আহুক-আহুকী ও অতিথি সন্ন্যাসী

এক সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন তীর্থভ্রমণে। অনেকটা পথ অতিক্রম করে তিনি এসে উপস্থিত হলেন এক ভীলপল্লীতে। সন্ন্যাসী শুধু একটু রাত্রিতে থাকবার স্থান খুঁজছিলেন। সামনে একখানি কুটীর দেখে সেইদিকে এগিয়ে গেলেন।

চারপাশে ভীষণ জঙ্গল। তার মধ্যে এই কুটীর দেখে সন্ন্যাসী ভাবলেন এখানে রাত্রি কাটানো উচিত হবে কিনা। ভীলপল্লীর ভিতরে গেলে তাঁকে দেখে হয়ত অনেক ভিড় জমে যাবে। তাতে তাঁকে বিব্রত হতে হবে। তার চেয়ে এই নির্জ্জন কুটীরেই আশ্রয় লওয়া ভাল।

এই ভেবে সন্ন্যাসী সেই কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হয়ে ডাক দিয়ে বললেন—"কে আছ কুটীরে? আমি অতিথি,—আজ রাত্রির মত আশ্রয় চাই।"

কুটীরে থাকত এক ভীল-দম্পতি; নাম তাদের আহুক ও আহুকী। যে সময় সন্ন্যাসী গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন আহুক কুটীরে ছিল না। শুধু আহুকী ছিল। সে সন্ন্যাসীকে দেখে তখনি যথেষ্ট ভক্তি দেখিয়ে তাঁকে আহ্বান করলে। সন্ন্যাসী তখন বললেন—"আজ রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই।"

আহুকী বললে—"আমার স্বামী বনে পশু শিকার করতে গেছে, এখনি এসে পড়বে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। যেকালে আমাদের কুটীরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে না।"

এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় আহুক শিকার থেকে ফিরল। সন্ন্যাসীকে দেখে আহুক খুব খুশি। সে বললে—"আজ আমাদের পরম ভাগ্য যে আপনি আমাদের কুটীরে অতিথি হতে এসেছেন। আপনার কোন কষ্ট হবে না। রাত্রে ফলমুল আর দুধ খেয়ে থাকুন। আর আমাদের এই একখানি কুটীর হলেও আপনাকে আমরা আশ্রয় দেব।"

এই কথা বলে আহুক নিজেদের বিছানা বাইরে পেতে নিয়ে কুটীরের মধ্যে সন্ন্যাসীর শয়নের ব্যবস্থা করে দিলে।

সন্ন্যাসী বললেন—"এ ভয়ানক জঙ্গলে বাইরে থাকা উচিত নয়, তোমরাও ভিতরে এস।"

কিন্তু একে সন্ন্যাসী, তাতে আবার অতিথি, তাই ভক্তিতে পাছে কোন ত্রুটি হয়ে পড়ে সেজন্য তারা দু'জনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে রাজী হল না।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে শয়ন করলেন আর আহুক ও আহুকী বাইরে দুটি শয্যায় শয়ন করল।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা বাঘ এসে আহুককে আক্রমণ করল। আহুকী ও সন্ন্যাসী বাঘকে তাড়িয়ে দিলে বটে, কিন্তু বাঘের থাবার প্রচণ্ড আঘাতে আহুক মৃত্যুমুখে পতিত হল।

পরদিন আহুকী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর চিতায় সহমরণের জন্য প্রস্তুত হলে সেই ভীলপল্লীর সকলে এসে সেখানে সমবেত হল। সন্ন্যাসীর সেদিন আর কোথাও যাওয়া হল না। তাঁর মনে এক দারুণ অনুশোচনা জাগল। তিনি অতিথিরূপে

এই ভীল-দম্পতির কুটীরে না এলে, আহুক কখনও বাঘের হাতে মরত না। কিন্তু দৈবের উপর কারো হাত নেই। তাই সন্ন্যাসী এ ব্যাপারকে অদৃষ্টলিপি বলে মনে সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করলেন।

এদিকে চিতা সাজানো হবার পর আহুকী সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হল।

ঠিক সেই সময়ে আহুকী ভাবলে মরবার আগে শেষবার শিবপূজা করে যাই। ভীলেরা সকলে শিবের উপাসক। তাই আহুকীর কথা শুনে তারা সকলেই রাজী হল।

শিবপূজার সব আয়োজন শেষ হলে আহুকী শিবপূজায় বসল। নিজের হাতে শিবের মূর্তি গড়ে ফুল-বেলপাতা দিয়ে শিবের অঙ্গ সাজিয়ে দিল। এদিকে আহুকীর শিবপূজা দেখে স্বয়ং শিব কৈলাস পর্বত থেকে সেই ভীলপল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে পার্বতীও আছেন।

তখন শিবপার্বতীকে দেখে সকলে ভক্তিভরে স্তবস্তুতি করতে লাগল।

শিব তখন আহুকীকে বললেন—"তোমার মত পুণ্যবতী রমণী পৃথিবীতে বিরল। ইহজন্মে তুমি স্বামী হারিয়ে অনেক দুঃখ পেলে। কিন্তু শোকে কাতর হয়ো না। সহমরণে গিয়ে তোমার বহু পুণ্য লাভ হবে। সেই পুণ্যফলে তুমি পরজন্মে রাজকন্যা দময়ন্তী হয়ে জন্মগ্রহণ করবে আর তোমার স্বামী আহুক নিষধরাজ নল হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তোমাদের নাম আদর্শ দম্পতিরূপে জগতে ছড়িয়ে পড়বে।"

শিবের কথা শুনে সকলে আহুক ও আহুকীর নামে জয়ধ্বনি করে উঠল। আহুকী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করল।

শিব ও পার্বতী সকলকে আশীর্বাদ করে আবার কৈলাসে ফিরে গেলেন।
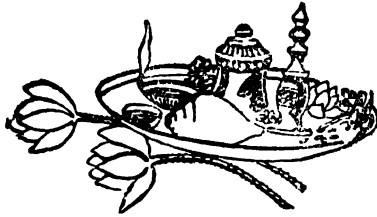
ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হল—উভয়ের মধ্যে কে বড়।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দু'জনে লেগে গেলেন যুদ্ধ করতে। বিষ্ণু বাণ মারেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা বাণ মারেন বিষ্ণুকে। কেউ কম যান না। দু'জনার এ যুদ্ধে পৃথিবী টলমল করে উঠল আর চারদিকে এমন অগ্নিবৃষ্টি হতে আরম্ভ হল যে, পৃথিবী ধ্বংস হবার যোগাড়।

তখন দেবতারা সকলে ছুটে গেলেন শিবের কাছে। শিবের স্তবস্তুতি করে বললেন সকলে—"প্রভো, আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বিবাদের মীমাংসা করে দিন, না হলে সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসেছে।"

শিব তখন ছুটে এলেন রণস্থলে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে তখন পরস্পর অগ্নিবাণ ছোড়া চলছে। শিব তখন একটা জ্যোতির স্তম্ভ হয়ে দু'জনার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

সেই জ্যোতির স্তম্ভ দেখে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লড়াই থেমে গেল। তাঁরা তখন অন্যদিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মীমাংসা করতে চাইলেন। সেই স্তম্ভের গোড়া কোথায় আর আগা কোথায় সেটা জানবার জন্য দু'জনের মধ্যে স্থির হল—বিষ্ণু বরাহের রূপ ধরে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীর নীচে নেমে যাবেন স্তম্ভের মূল আবিষ্কারে আর ব্রহ্মা হাঁস হয়ে আকাশে উড়ে ওপরে উঠে যাবেন স্তম্ভের আগা আবিষ্কার করবার জন্য।

এতে যে আগে সফলতা লাভ করতে পারবে দু'জনার মধ্যে সেই হবে বড়।

যেমন কথা তেমনি কাজ আরম্ভ হল। বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধরে দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাতালে নেমে গেলেন। আর ব্রহ্মা একটি হাঁসের রূপ ধরে আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গেলেন। কিন্তু, দু'জনার মধ্যে কেউই না পারলেন স্তম্ভের গোড়া আবিষ্কার করতে আর না পারলেন স্তম্ভের আগা আবিষ্কার করতে।

ব্রহ্মা ভাবলেন, এ কি কাণ্ড! এমন তো কোথাও দেখা যায় নি বা শোনাও যায় নি। বিষ্ণুও ভাবলেন, আমি স্তম্ভের গোড়া আবিষ্কার করতে পারছি না, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে, কিন্তু তবুও তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না।

এদিকে ব্রহ্মা আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেও যখন আগার সন্ধান পেলেন না তখন মনের দুঃখে ফিরে আসবার সময় দেখতে পেলেন একটি কেতকী ফুল স্তম্ভের গা থেকে খসে পড়ে পৃথিবীর দিকে আসছে। তিনি তখনি কেতকী ফুলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেতকী ফুল, তুমি কি এই স্তম্ভের আগা দেখেছ?"

কেতকী উত্তর দিল—"না।"

তখন ব্রহ্মা চতুরতা করে কেতকী ফুলকে শিখিয়ে দিলেন, "আমি যখন বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বলব যে আমি স্তম্ভের আগা দেখে এসেছি, তখন তুমি বলবে যে সেকথা সত্য।"

কেতকী ফুল প্রথমে বিষ্ণুর কাছে মিথ্যা কথা বলতে রাজী

হয় নি। কিন্তু, ব্রহ্মা তাকে অনেক ভয় দেখিয়ে শেষে রাজী করালেন।

এবার ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—"হে বিষ্ণু, তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আমি যেমন সকলের পিতামহ, তেমনি তোমারও পিতামহ।"

একথা শুনে বিষ্ণু বললেন—"তুমি যতই আস্ফালন কর না ব্রহ্মা, আমার নাভি থেকেই তোমার জন্ম হয়েছিল। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আমি তোমার পিতা।"

ব্রহ্মা তখন বললেন—"ওসব কথা থাক্। আমি স্তম্ভের আগা দেখে এসেছি। এটা সত্য কি মিথ্যা তুমি এই কেতকী ফুলকে জিজ্ঞাসা কর।"

বিষ্ণু তখন কেতকী ফুলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হে কেতকী ফুল, তুমি সত্য করে বল ব্রহ্মা এই স্তম্ভের আগা দেখে এসেছে কিনা।"

কেতকী ফুল তখন বললে—"হাঁ, ব্রহ্মার কথা সত্য, তিনি আগা দেখে এসেছেন"।

বিষ্ণু এই কথা শুনে নিজের পরাজয় স্বীকার করলেন ও যাতে পূর্ব আলাপ-আলোচনা ও বন্ধুত্ব বজায় থাকে তার চেষ্টা করলেন।

শিবের কিন্তু মিথ্যাবাদী ব্রহ্মার ওপর খুব রাগ হল। তিনি তখন ভৈরব নামে এক দানবের সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে ব্রহ্মার পাঁচটা মাথার একটি মাথা কেটে ফেললেন।

ব্রহ্মা তখন শিবের ভয়ে নিজের দোষ স্বীকার করলেন।

পাঁচটি মাথার একটি তখন কাটা গেছে, কাজেই চারটি মাথা নিয়েই ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

শিব তখন বিষ্ণুকে সর্বতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হবার বর দান করে আর ব্রহ্মাকে কোন বর না দিয়ে কৈলাসে ফিরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মা এসে কাতরভাবে শিবের কাছে বললেন—"প্রভো, আমার উপায় কি হবে?"

শিবের তখন আর ক্রোধ ছিল না। তিনি বললেন—"যেখানেই যজ্ঞ হোক তুমি সেখানে পাবে পূজা। কিন্তু কেতকী ফুলে কোন দেবতারই পূজা হবে না।"

ব্রহ্মা তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এলেন।

কেতকী তখন খুব কাঁদতে লাগল। শিবের তখন দয়া হল। তিনি বললেন—"আচ্ছা, আমার পূজা ছাড়া তোমাকে দিয়ে অন্য সব দেবতার পূজা হবে।"

এই বলে শিব কৈলাসে ফিরে গেলেন।

অত্রি মুনি ও অনসূয়া

কামদ বনে বাস করতেন অত্রি মুনি ও তাঁর পত্নী অনসূয়া। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন তাঁরা। বনের ফলমূল খেতেন আর পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকতেন।

ক্রমে এমন দুর্বৎসর এল যখন বৃষ্টি আর হয় না, চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল।

সকলে অত্রি মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়ে কাতরভাবে তাঁকে বললে—"হে মহর্ষি, আপনি ত অনেক যাগযজ্ঞ করেছেন, এবার এমন যজ্ঞ করুন যাতে বৃষ্টি হয়।"

অত্রি মুনি তখন যজ্ঞ করবার আয়োজন করলেন। যজ্ঞ করবার ঠিক আগে বসলেন শিবের ধ্যানে।

অনসূয়াও শিবপূজা আরম্ভ করলেন।

অত্রি মুনি শিবের ধ্যান করেন আর ভাবেন কতদিনে শিব প্রসন্ন হবেন, তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করবেন।

অনসূয়া শিবপূজার শেষে প্রতিদিন সংসারের কাজকর্ম করেন আর তপস্যারত স্বামীর সেবা করে পরিতৃপ্ত হন।

এই ভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটতে লাগল। এদিকে অনাবৃষ্টির ফলে শস্য আর জন্মে না, নদীতে আর জল থাকে না, বনে বনে শুকনো কাঠে দাবানল জ্বলতে লাগল। তখন সকলে আবার ছুটে এসে অত্রি মুনিকে জানালে —"তপস্যা কবে শেষ হবে, কবে বৃষ্টিধারা নামবে?"

মেয়েটি বললে—"আমি গঙ্গাদেবী···আমি থাকব কোথায় ?" (৯৮ পৃঃ)

অত্রি মুনি বললেন—“তপস্যা শেষ হতে আর দেরি নেই। তপস্যা শেষ হলেই অনাবৃষ্টি দূর হবে।”

সকলে আশান্বিত হয়ে চলে গেল।

এর কিছুদিন পরেই অত্রি মুনির তপস্যা শেষ হল।

তপস্যাশেষে অত্রি মুনির খুব পিপাসা পেল। তাই তিনি অনসূয়াকে বললেন—“অনসূয়ে, আমার পিপাসা পেয়েছে, শীঘ্র জল আন।”

অনসূয়া তখনি একটি কলসী নিয়ে জলের সন্ধানে বনের পথে ছুটলেন। কিন্তু কোথাও জল পেলেন না।

কিছুদূর যাবার পর অনসূয়া দেখতে পেলেন, এক পরমসুন্দরী মেয়ে সেই দিকে আসছে।

তিনি তখন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন—“তোমাকে ত কোন দিন এ বনে দেখি নি, তুমি কে মা ?”

মেয়েটি বললে—“আমি গঙ্গাদেবী। তোমার স্বামী শিবের তপস্যা করছিলেন। শিব আমাকে তাই পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি থাকব কোথায় ?”

অনসূয়া বললেন—যদি এসেছ মা, তবে আমাদের আশ্রমের কাছেই থাক।

এই বলে অনসূয়া একটি গর্ত করে গঙ্গাদেবীকে সেখানেই থাকতে বললেন।

দেখতে দেখতে গঙ্গাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর গর্ত গঙ্গাজলে পূর্ণ হল। সেই জল নিয়ে অনসূয়া তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন অত্রি মুনির কাছে।

জল পান করে অত্রি মুনি বললেন—"চমৎকার জল, এ জল তুমি পেলে কোথায় ?"

অনসূয়া বললেন—"তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিবঠাকুর গঙ্গাদেবীকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

অত্রি আশ্চর্য হয়ে বললেন—"কৈ কোথায় গঙ্গাদেবী ?"

অনসূয়া তখন তাঁকে সঙ্গে করে গর্তের কাছে নিয়ে গেলেন।

গর্তটি তখন জলে পূর্ণ।

অত্রি মুনি তখন গঙ্গার স্তব করলেন। গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হয়ে দৈববাণীতে জানালেন—"কি চাও বৎস ?"

অত্রি বললেন—"তুমি মা আর যেন এখান থেকে চলে যেও না।"

গঙ্গাদেবী বললেন—"তোমার তপস্যায় আকাশে মেঘসঞ্চার হয়েছে। নদনদী এখনি বৃষ্টির জলে ভরে উঠবে, আমাকে আর কেন আটকে রাখতে চাও বৎস ? তবে তুমি যদি একবৎসরের পুণ্যফল দাও, তবে থাকি।"

অত্রি বললেন—"বেশ, আমি তাই দিলাম।"

গঙ্গাদেবী বললেন—"কিন্তু আমাকে এখানে ধরে রাখলে আমি শিবের কাছে ফিরে যাব কেমন করে ? তাই এখানে মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা কর, শিব ছাড়া আমি ত থাকি না।"

অত্রি মুনি তখন সেখানে শিব প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই তীর্থের নাম অত্রীশ্বর তীর্থ।

সাত দিনের শিশু সেনাপতি

অসুরদের রাজা ছিল তারকাসুর।

তারকাসুর স্বর্গ হতে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করবে এই ছিল তার কামনা।

তাই ব্রহ্মার আরাধনায় কঠোর তপস্যা করতে সে বনে চলে গেল।

তার সেই তপস্যা দেখে দেবতারা শঙ্কিত হলেন। তাঁরা সকলে ব্রহ্মার কাছে গেলেন, বললেন—"আপনাকে পূজা করে কঠোর তপস্যা করছে তারকাসুর। তাকে নিবৃত্ত করুন, তা না হলে দেবতাদের মহাবিপদ।"

ব্রহ্মা এবার এলেন তারকাসুরের কাছে। তারকাসুর তখন ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বর চাইলে।

ব্রহ্মা বললেন—"কী বর চাও তুমি?"

তারকাসুর বললে—"আমাকে অমর হবার বর দিন।"

ব্রহ্মা বললেন—"সে আমি পারব না, তুমি অন্য বর চাও।"

তারকাসুর বললে—"তবে এই বর দিন যে, সাত দিনের ছেলে ছাড়া কারোর হাতে আমার মৃত্যু হবে না।"

ব্রহ্মা মৃদু হেসে সেই বর দিলেন।

তারকাসুর তখন আনন্দিত মনে নিজের রাজ্যে ফিরে এল।

এবার তারকাসুর সৈন্যসামন্ত নিয়ে স্বর্গ আক্রমণ করল। দেবতারা ত ভয়েই অস্থির। তারকাসুর ব্রহ্মার বর পেয়েছে, এবার কি আর রক্ষা আছে!

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র মহাভাবনায় পড়লেন। কি আর করবেন তিনি, কিছুদিন যুদ্ধ করে যুদ্ধে হেরে গিয়ে স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন তিনি স্বর্গ থেকে।

তারকাসুর তখন স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে দেবতাদের ভৃত্যের মত খাটাতে লাগল। দেবতারা তার শাসনে ও অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠলেন।

তখন সকলে ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মা বললেন—"আমিই ত বর দিয়েছি, এখন আমি সে বর কেড়ে নেব কি করে? তার চেয়ে তোমরা শিবের কাছে যাও, তিনি নিশ্চয়ই এর একটা ব্যবস্থা করবেন।"

দেবতারা তখন কৈলাস পর্বতে ছুটে গেলেন শিবের কাছে। শিব সমস্ত কথা শুনে হেসে বললেন—"এইবার তারকাসুরের পতন হবে।"

দেবতারা শিবের মুখে হাসি দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন—"তবে উপায় বলে দিন প্রভো!"

শিব তখন বললেন—"তারকাসুর নিজেই ব্রহ্মার কাছে বর চেয়ে নিয়েছে যে সাত দিনের ছেলে ছাড়া কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। তারকাসুর ভেবেছে যে, ত্রিভুবনে সাত দিনের ছেলে যে তাকে মারতে পারে এটা একেবারেই অসম্ভব। তাই সে নিশ্চিন্ত হয়ে দেবতাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে! আমার ছেলে কার্তিক ছয়দিন আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এখন তার বয়স মাত্র সাত দিন। তাকেই আমি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দেবতারা তখন উৎসাহে ও আনন্দে স্বর্গে ফিরে গেলেন! এদিকে তারকাসুর শুনলে যে এক সাত দিনের শিশু তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে। এই কথা শুনে তারকাসুর হা-হা করে হাসতে লাগল; মনে ভাবল, সেই শিশুটাকে একটা আঙুলের চাপেই মেরে ফেলবে সে, তাই সে যুদ্ধক্ষেত্রে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এদিকে সাত দিনের শিশু কার্তিক একটা রথের ওপর চেপে এল যুদ্ধক্ষেত্রে, এসেই তারকাসুরকে এমন এক বাণ মারলে যে সেই দারুণ আঘাত পেয়ে তারকাসুর ভাবলে, এ শিশু তো সামান্য নয়! তাই সেও কার্তিককে লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়তে লাগল। কার্তিক অনায়াসে তার নিজের বাণ দিয়ে সে সব বাণকে ব্যর্থ করে দিলে।

এই ভাবে ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগল। তারকাসুর প্রথমে কার্তিককে দেখে যে উপহাস করেছিল, এখন সে বুঝতে পারলে এবার তার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। তা না হলে সাত দিনের শিশুর কি এত শক্তি হয়! কিন্তু তবু সে নিরাশ হল না। প্রাণপণ যুদ্ধ করে যেতে লাগল।

ত্রিভুবন ভীত ও বিস্মিত হয়ে তারকাসুর ও কার্তিকের এই যুদ্ধ দেখতে লাগল। শেষে কার্তিক তারকাসুরের দম্ভ আর সহ্য করতে না পেরে শিবের দেওয়া ও পার্বতীর আশিস্‌পূত মহা অস্ত্র মহাশক্তি ছুঁড়ে মারলেন তারকাসুরের দিকে।

তারকাসুর সে আঘাত সহ্য করতে পারলে না। মাটিতে পড়ে ছটফট্ করতে করতে প্রাণত্যাগ করল।

এবার স্বর্গে দেবতাদের বিজয়-ভেরী বেজে উঠল, সকলে "জয় সেনাপতি কার্তিকের জয়" বলে সাত দিনের শিশুকে অভিনন্দিত করলেন।

তারকাসুর নিহত হয়েছে সংবাদ শুনে ইন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন আবার স্বর্গের সিংহাসনে বসবার জন্য। যেসব দেবতাকে তারকাসুর বন্দী করে কারাগারে রেখেছিল তাঁরা মুক্তি পেয়ে সকলে কার্তিকের জয়ধ্বনি করে উঠলেন।

তখন চারদিকে বিজয়োৎসবের সাড়া পড়ে গেল। এই প্রথম যুদ্ধে অসুরদের হারিয়ে দিয়ে কার্তিক 'দেব-সেনাপতি' এই নাম পেয়ে গেলেন। দেবতারাও অসুরদের তাড়িয়ে দিয়ে আবার নিশ্চিন্তমনে স্বর্গে বসবাস করতে লাগলেন।

জয়-বিজয়ের বিপদ

বৈকুণ্ঠের দ্বারে দাঁড়িয়ে সনক মুনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"কি! এত বড় স্পর্ধা তোদের! আমি মর্ত্যধাম থেকে দূর পথ অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠে এসেছি নারায়ণকে দেখব বলে—তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কইব বলে, কিন্তু তোরা সামান্য দ্বারপাল হয়ে এত অহঙ্কারী হয়েছিস যে আমাকে এখানে ঢুকতে দিবি না?"

জয় আর বিজয় দু'জন দ্বারপাল বৈকুণ্ঠের দ্বারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল যাতে কেউ বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করে নারায়ণের বিশ্রামের ব্যাঘাত না করতে পারে। এমন সময় সনক ঋষি এসে জোর করে বৈকুণ্ঠধামে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তাই জয় ও বিজয় তাঁকে বাধা দিয়েছে।

সনক ঋষি রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাদের দু'জনকে অভিশাপ দিলেন—"তোদের দু'জনকে স্বর্গ ছেড়ে গিয়ে মর্ত্যে জন্ম নিতে হবে।"

এই কথা শুনে জয়-বিজয় তখন মহাবিপদ বুঝে নারায়ণের কাছে গিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল—"প্রভু, আমাদের সনক মুনির অভিশাপ থেকে বাঁচান।"

নারায়ণ বললেন—"আমি সে অভিশাপ থেকে তোমাদের বাঁচালে ঋষির অবমাননা করা হবে। তাই তোমাদের এ অভিশাপে মর্ত্যে জন্ম নিতেই হবে, তবে তোমাদের মুক্তির জন্য যদি তোমরা আমার মিত্ররূপে থাক তা'হলে সাতজন্মে, আর যদি শত্রুরূপে থাক তা'হলে তিনজন্মে তোমরা উদ্ধার পাবে।"
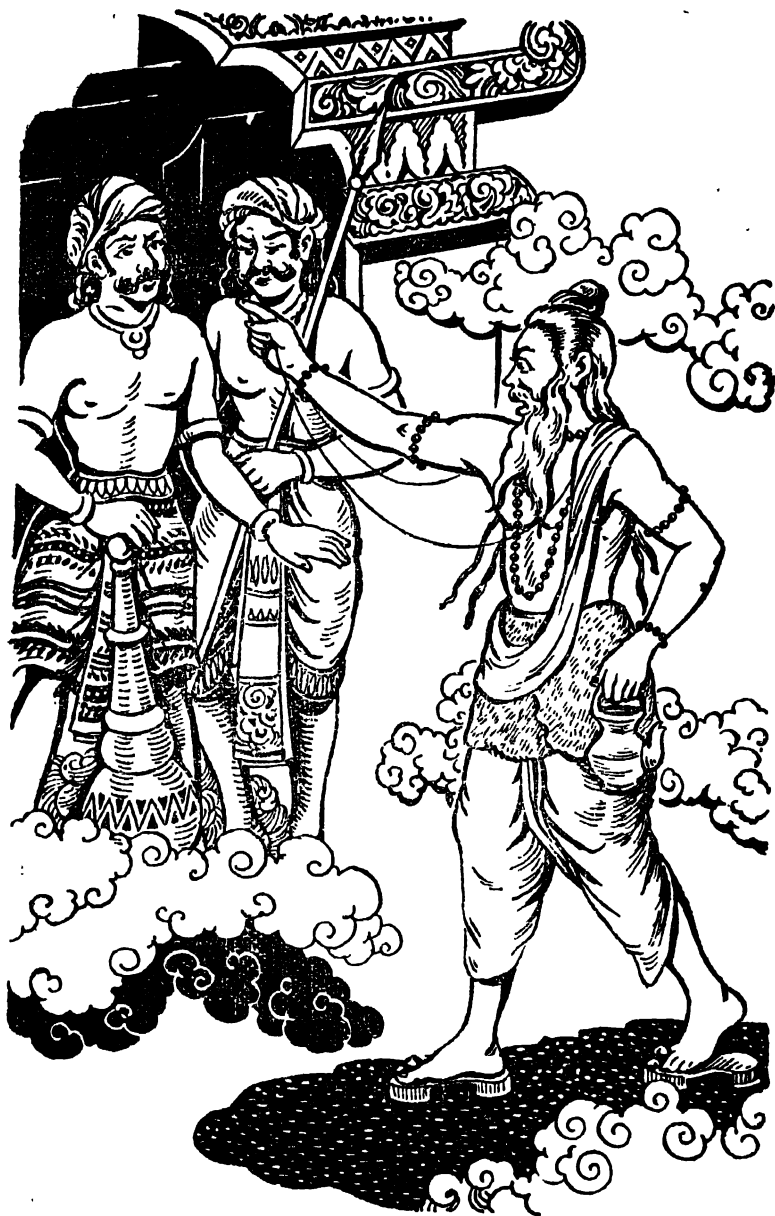
সনক ঋষি অভিশাপ দিলেন—"তোদের স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে জন্ম নিতে হবে।"

তখন জয় ও বিজয় মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে নারায়ণের শত্রুরূপে থাকবে এই কামনা করলে।

প্রথম জন্মে দু'জনে হল কশ্যপের পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। তারা জন্ম থেকেই নারায়ণের ঘোর শত্রু হয়েই রইল, শেষে নারায়ণের নরসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু নারায়ণের হাতে নিহত হলেন আর হিরণ্যাক্ষকেও নারায়ণ বধ করে ফেললেন।

দ্বিতীয় জন্মে জয় ও বিজয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ হয়ে ঘোরতর নারায়ণ-বিদ্বেষী হয়ে পড়ল। তখন স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্ররূপে অবতার হয়ে জন্ম নিলেন আর তাঁর হাতেই এরা দু'জন নিহত হল। , তৃতীয় জন্মে জয় ও বিজয় শিশুপাল ও দন্তবক্র হয়ে নারায়ণের শত্রু হল। এবারেও নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অবতার হয়ে এদের দু'জনকে নিধন করলেন।

এইভাবে জয় ও বিজয়ের অভিশাপ মোচন হল। এদিকে লক্ষ্মীর মনে মনে একটা সাধ ছিল যে, তিনি নিজের চোখে নারায়ণের যুদ্ধ দেখবেন। সেকথা এর আগে একদিন মুখ ফুটে নায়ায়ণকে জানিয়েছিলেন। নারায়ণ হেসে বলেছিলেন—"আমি অবতার হয়ে জন্ম নিলেই তুমিও তখন আমার যুদ্ধ দেখতে পাবে। এখন জয়-বিজয়ের তিনজন্মের সময় তুমি আমার যুদ্ধ দেখেছ।"

একথায় লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি নারায়ণের চরণতলে প্রণাম করে বললেন—"প্রভু, আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু। তাই আপনার কৃপায় আমার কামনা পূর্ণ হয়েছে।"

আশ্চর্য পুরী

ময়দানব দেবতাদের পরম শত্রু। সে নিজে ছিল একজন নিপুণ স্থপতি ও কারিগর। অনেক ভেবেচিন্তে সে এমন একটি পুরী নির্মাণ করলে যা ত্রিভুবনে কেউ দেখে নি। এই দুর্ভেদ্য পুরী থেকেই সে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে স্থির করলে। এর নাম দিল সে ত্রিপুরনগরী।

এ ত্রিপুরনগরী অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথমে খুব উঁচু লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তাকে দুর্ভেদ্য করে তুলল ময়দানব। তারপর আবার দিল রূপার প্রাচীর। তারপরে আবার দিল সোনার প্রাচীর। এই ভাবে খুব সুরক্ষিত করে তুলল ত্রিপুর। শত্রু যত শক্তিমানই হোক না কেন, এ নগরীতে ঢোকে কার সাধ্য! ময়দানব ভাবলে এইবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করা গেল।

দেবতারা মহাভীত হয়ে পড়লো ময়দানবের বিক্রম দেখে। দানবেরা স্বর্গ আক্রমণ করে যায়, কিন্তু দেবতারা দানবের পুরীতে ঢুকতে পারেন না। এই ভাবে দেবতারা খুবই বিপদে পড়লেন।

এদিকে ময়দানব তপস্যা করে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে তাঁর কাছে বর নিয়েছিল যে, যদি কেউ অর্ধনিমেষের মধ্যে ত্রিপুরনগরী ধ্বংস করতে পারে তবেই ময়দানবের মৃত্যু হবে, নইলে কেউ তাকে নিহত করতে পারবে না। এই বর পেয়ে ময়দানবের স্পর্ধা আরও বেড়ে গেল।

দেবতারা তখন ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন—"আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমি একবার যেকালে তাকে বর দিয়েছি তখন তার কোন ক্ষতি করতে পারব না।"

দেবতারা তখন ছুটে গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন—"ও সব দৈত্যদানব অসুরের ব্যাপার শিবই বোঝেন ভাল, তোমরা শিবের কাছে যাও।"

দেবতারা তখন শিবের কাছে গেলেন। সমস্ত কথা শুনে শিব বললেন—"দেবতাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। বেশ, আমি নিজে যাব ময়দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।"

দেবতাদের মধ্যে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। আর ভয় নেই, এইবার ময়দানবের ধ্বংস নিশ্চিত।

ময়দানবের কানেও এ সংবাদ পৌঁছল। সে তখন ভাবলে—আমার কি এতবড় সৌভাগ্য হবে যে স্বয়ং শিব আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেন? আমি যদি মরি, তবে শিবের হাতেই মরব।

এদিকে ত্রিপুরের মধ্যে ময়দানব প্রত্যহ শিবের উপাসনা করে, শিবলিঙ্গকে সামনে রেখে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে তাঁর পূজা দেয়, শিবের স্তবস্তুতি করে, গীতবাদ্যের আয়োজন করে।

দেবতারা ময়দানবের শিবভক্তি দেখে বলাবলি করেন—"কি জানি শিব সহজেই ভুলে যান ভক্তের দোষ! শেষে যদি যুদ্ধ করতে রাজী না হন?"

শিব এ কথা শুনে বললেন—"ভয় নেই, আমি যুদ্ধে যাব।"

সত্যই এবার শিব যুদ্ধ করতে এলেন ময়দানবের সঙ্গে। যে সব অসুর ত্রিপুরনগরীতে ছিল তারা সকলেই দেবসৈন্যের হাতে মারা পড়ল।

শিবের অনুচরেরা ত্রিপুরপুরী আক্রমণ করল। কিন্তু লৌহপ্রাচীর ভেদ করে তারা ভিতরে যেতে পারল না। ময়দানব রৌপ্য ও স্বর্ণ প্রাচীরের অন্তরালে লুকিয়ে রইল।

তখন দেবতারা শিবকে বললেন—"প্রভো, আপনি ত্রিপুরপুরী ধ্বংস করে ফেলুন। আর বিলম্ব করে কাজ কি?"

শিব হেসে বললেন—"আমার ভক্ত ময়দানব যে এখনও ত্রিপুরে আছে, আমি কেমন করে তাকে ধ্বংস করব?"

শিব তখন ময়দানবকে সংবাদ দিলেন,—"তুমি আমার আদেশে এখনি ত্রিপুর পরিত্যাগ কর।"

শিবের আদেশ শুনে ময়দানব তখনি ত্রিপুর ত্যাগ করে তার আরাধ্যদেবতা শিবমূর্তি বুকে করে পাতালে চলে গেল।

পরমুহূর্তেই শিবের নেত্রের আগুনে ত্রিপুর ভস্ম হয়ে গেল। দেবতাদের জয়ধ্বনিতে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল।

ওষধির জন্ম

ব্রহ্মার বরে অতুলশক্তি লাভ করে কর্কটি রাক্ষসীর ছেলে ভীমরাক্ষস মাকে এসে বলল—“মা, দেবতারা আমাদের চিরশত্রু। তারা আমাদের ধ্বংস করবার জন্য সর্বদাই পরামর্শ আঁটছে। আমি এখন ব্রহ্মার বরে যে ক্ষমতা পেয়েছি সেই ক্ষমতাবলে দেবতাদের স্বর্গ থেকে তাড়াব।”

তার মা কর্কটি বলল—“বাছা, দেবতাদের তাড়ানো সহজ কথা নয়। তাদের কাছে আছে অমৃত, তাই খেয়ে তারা নবশক্তি লাভ করে, আর তা' ছাড়া পৃথিবীর যাগযজ্ঞের ঘি ও অর্ঘ্য তারা পেয়ে আরও শক্তিমান হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ও তাদের পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব।”

ভীমরাক্ষস বললে—“মা আমি এখন ব্রহ্মার বরে যে ক্ষমতা লাভ করেছি, তাতে আমি এখন পৃথিবীর রাজা। আমার আদেশে কোন দেশে কেউ আর যাগযজ্ঞ করতে পারবে না।”

কর্কটি বললে—“তুমি মর্ত্যে যা ভাল বোঝ কর, কিন্তু স্বর্গ নিয়ে আর ঝগড়া বিবাদ করো না।”

ভীমরাক্ষস মায়ের কথায় কান দিলে না। প্রথমেই সে যাগযজ্ঞ বন্ধ করে দিলে। কোন দেবতার পূজা আর হবে না।

এর ফলে দেবতারা খুব রেগে গেলেন। আর পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি, শস্যহানি, মড়ক, বন্যা প্রভৃতি হতে লাগল। যজ্ঞাদি বন্ধ হওয়াতে মুনি-ঋষিরা বিমর্ষমুখে কালযাপন করতে লাগলেন।

এদিকে নূতনশক্তি লাভ করে ভীমরাক্ষস অনেক দেশ জয় করে ও অনেক রাজাকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দিলে। বন্দী রাজাদের মধ্যে কামরূপের রাজাও ছিলেন। তিনি পরম শিবভক্ত।

প্রহরীরা এসে ভীমরাক্ষসকে সংবাদ দিলে—"বন্দী কামরূপের রাজা কারাগারের মধ্যে মাটির শিব মূর্তি গড়ে পূজা করেন।"

ভীমরাক্ষস তখনি কামরূপের রাজার কাছে গিয়ে বললে—"তুমি আমার আদেশ অমান্য করে কারাগারের মধ্যে শিবপূজা করেছ কেন ?

কামরূপের রাজা বললেন—"শিব হলেন, দেবাদিদেব। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। অশিব অর্থাৎ অমঙ্গলকে ধ্বংস করেন তিনি। তাঁর পূজা করলে আমি দুঃখ থেকে মুক্তি পাব।"

ভীমরাক্ষস বললে—"যে দেবতা ভিক্ষে করে বেড়ায়, শ্মশানে-মশানে ঘোরে, গায়ে ছাই মাখে, সে দেবতা আবার দেবতা কিসের ? তাকে আমি দেবতা বলেই মনে করি না। আমার আদেশ অমান্য করে তুমি সেই ভিখারী দেবতার পূজা করছ ? তোমাকে আমি শাস্তি দেব।"

এই কথা বলে ভীমরাক্ষস বললে—"এখনও বলছি তোমার ঐ শিবপূজা ছাড়ো।"

কামরূপের রাজা বললেন—"তোমার ভয়ে আমি কখনও শিবপূজা ছাড়ব না। আমি বিপদে পড়লে শিব নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করবেন।"

এই কথা শুনে ভীমরাক্ষস বললে—"তোমার প্রমাণ দিতে পার ?"

কামরূপের রাজা বললেন—"নিশ্চয়ই পারি।"

এই কথা শুনে ভীমরাক্ষস তার হাতের খড়্গ কামরূপের রাজাকে কাটতে গেল।

সেই মুহূর্তেই শিব সেখানে আবির্ভূত হয়ে সেই খ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

ভীমরাক্ষস তখন একটা শূল ছুঁড়ে কামরূপের রা প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হল। মহাদেবের কৃপায় সেই শূল টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল। কামরূপের রাজার গায়ে লাগল না!

তখন ভীমরাক্ষস শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে শিবের ওপর লাফিয়ে পড়ল। শিব তখন তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন। সে দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আগুন এসে ভীমরাক্ষসকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। শিব নিজে তখন সেই ছা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। যেখানে যেখানে সেই ছা পড়ল, পৃথিবীর সেই সব জায়গায় ওষধির গাছ হল।

এই ভাবে শিবের কৃপায় ভীমরাক্ষসের ভস্ম থেকে জ মঙ্গল হল।